ছোটদের ভালো ভালো গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৯

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

দাম দুই টাকা

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

হেডমাষ্টার ৯ ॥ হুটুমোক্তারের সওয়াল ৫০
সুকু ও ভুকু ৭৩ ॥ কালাপাহাড় ৮৮

হেডমাষ্টার

ছাত্ররা পিল পিল করে বেরিয়ে গেল ইস্কুল থেকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোটা ইস্কুল-বাড়িটা শূন্য হয়ে গেল, খাঁ-খাঁ করে একটা শূন্যতা। শিক্ষকেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণবাবু।

ছ ফুট লম্বা শীর্ণদেহ সোজা মানুষ, চোখে পলকহীন দৃষ্টি; বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত দীর্ঘ মিছিলে সারিবন্দী সাড়ে তিন শো ছেলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ বছরের শিশু থেকে ষোল-সতের বছরের দল। চীৎকার করছে, আমাদের দাবী—

—মানতে হবে।

চন্দ্রভূষণবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের কানে শোনা ওই শব্দগুলোর অর্থ যেন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

ছেলের দল কম্পাউণ্ড থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে চলে গেল। হেডমাষ্টারমশায় সিঁড়ির মাথা থেকে ফিরলেন। ছ ফুট মানুষটির পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই চিরকালই দীর্ঘ। একটু সামনে ঝুঁকে লম্বা পা ফেলেই তিনি হাঁটেন। বারান্দার কোলেই ইস্কুলের হল। সারিবন্দী চারটি চার ফুট বাই আট ফুট দরজা। একটা দরজার মুখে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মাষ্টারমশায়দের দেখতে পেলেন। চৌদ্দজন মাষ্টারের মধ্যে চারজন ছাড়া আর সকলেই তাঁর ছাত্র। হেড-পণ্ডিত কিশোরীমোহন কাব্য-বেদান্ততীর্থ তাঁর থেকে বয়সে বৎসর দুয়েকের বড়, মৌলবী সাহেব জনাব জিয়াউদ্দিন খান তাঁর সমবয়সী; আর দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন; বয়সে তরুণ তাঁরা, তাঁর ছাত্র

নন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু বলতে চাইলেন, ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল; তিনি মুখ ঘুরিয়ে আবার অগ্রসর হলেন। হলের মধ্যে ঢুকলেন।

বিস্তীর্ণ হল। চারটি চার ফুট দরজায় ষোল ফুট এবং ছটি দরজার মধ্যে পাঁচটি ও পাশে দুটি ছ ফুট দেওয়ালে বিয়াল্লিশ ফুট—মোট আটান্ন ফুট লম্বা-চওড়া আঠাশ ফুট হলে পাশাপাশি তিনটে ক্লাস শূন্য পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ করছে। ওপাশের দেওয়ালে মার্বেল ট্যাবলেট গাঁথা রয়েছে। দরজার মাথায় মাথায় ছবি টাঙানো রয়েছে। পশ্চিম দিকের চওড়া দেয়ালটার মাঝখানে ক্লকটা চলছে—ঘরখানা এমনি স্তব্ধ যে ক্লকটার পেণ্ডুলাম চলার শব্দটাই একমাত্র শব্দ হয়ে উঠেছে; অবিরাম শব্দ উঠছে টক্ টক্, টক্ টক্, টক্ টক্। কতদিন ছুটির পর এমনই শূন্য স্তব্ধ হলের মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলে গেছেন—কত ছুটির দিন প্রয়োজনে এসে তিনি এই হল দিয়েই লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকেছেন কিন্তু কোনদিন এমন স্পষ্টভাবে তিনি ঘড়ি চলার শব্দ শুনতে পাননি। তিনি থমকে দাঁড়ালেন; মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-দিনের কথা। উনিশ শো সাঁইত্রিশ সাল—ষোল বছর আগে তাঁর চব্বিশ বছরের ছেলে ব্রজকিশোর যেদিন মারা গিয়েছিল সেই দিনের কথা। ব্রজকিশোরের শেষকৃত্য সেরে বাড়ীতে ফিরে ব্রজকিশোরের ঘরে ঢুকেছিলেন; বাড়ীতে তিনি একা; দশ বছরের ব্রজকিশোরকে রেখে তার মা মারা গিয়েছিল, কাঁদবার কেউ ছিল না। ব্রজকিশোরের ঘরখানায় তার জিনিসপত্র যেমন সাজানো তেমনিই ছিল; টেবিলের উপর সেদিন ব্রজর টাইমপিস্‌টা ঠিক এমনিভাবে শব্দ করেছিল। না; শব্দ ঘড়িটা বরাবরই করত, কতদিন ব্রজর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ঢুকে বই এনেছেন বই রেখে এসেছেন, এই তো অসুখের সময়ও

তিনি বসে থেকেছেন ব্রজর পাশে—ঘড়িটা ঠিক এইভাবেই শব্দ করে চলেছে, শব্দ করাই ওর ধর্ম ; কিন্তু শব্দটা কানে ঠেকত না ; সেদিন ঠেকেছিল ; এই আজকের মতই ঠেকেছিল। অথবা সেদিনের মতই ঠেকছে আজকের শব্দটা।

কাছে এসে দাঁড়ালেন হেড-পণ্ডিতমশায়। চলুন, আপিসে চলুন মাষ্টার—। মশাইটা আর মুখ থেকে বের হ'ল না তাঁর। চন্দ্রভূষণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাঁর জীবনের তপস্যার সকল পুণ্য এই ইস্কুলকে দিয়েছেন তিনি। তার অকাল-মৃত্যু হবে না। মনে মনে ভাবতেন, ব্রজকিশোরের বিয়ের সময় একটি মনোহর উৎসব করবার গোপন অভিপ্রায় তাঁর মেটেনি, নবগ্রাম ইস্কুলের জয়ন্তী উপলক্ষে সে সাধ মেটাবেন তিনি।

অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন তিনি করবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর সকল কল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ছেলেরা ধর্মঘট করে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে চলে গেল ; বলে গেল—তাঁকে তারা মানে না, বলে গেল—তিনি অত্যাচারী, বলে গেল—তাঁর ধর্মকে তারা চায় না!

তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। তারা জানিয়ে দিয়ে গেল—তাদের ধর্মকে না মানলে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করবে।

হেড-পণ্ডিতমশায় ডাকলেন কেষ্টকে। কেষ্ট, অরে অ কেষ্ট!

সত্তোরের কাছাকাছি বয়স কেষ্টর। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে সে আপিস-ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে ঘুমোয়। বসে বসে ঘুমোনো কেষ্টর অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ সে পার্সী ক্লাসের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল ; এটা কি হ'ল? এ কি কাণ্ড? হে ভগবান! হেড-

মাষ্টারের সামনে দিয়ে তার হুকুম ডোণ্টকেয়ার করে ছেলেগুলো চলে গেল? হেড-পণ্ডিতের ডাক শুনে সে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি পার্সী ক্লাস থেকে বেরিয়ে হলে এসে দাঁড়াল।—আজ্ঞে!

পণ্ডিতমশায় বললেন—হলের দরজাগুলো বন্ধ কর বাবা!

এতক্ষণ পর্যন্ত চন্দ্রভূষণবাবু নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন—শুধু মৃদুস্বরে পণ্ডিতমশাইকে একবার বলেছিলেন—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়। ওই ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ শুনে। সকরুণ মৃদু কণ্ঠস্বর। সে কথাগুলো কোন ধ্বনি তোলেনি, ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ একটুও ঢাকা পড়েনি; পণ্ডিত-মশায় ছাড়া আর কেউ শুনতেও পায়নি।

এবার হলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বলে উঠলেন—না।

হলখানা গম্ গম্ করে উঠল। না—। ঘড়ির শব্দ আর শোনা গেল না। সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত হলখানার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধতার জালখানা অকস্মাৎ যেন দু টুকরো হয়ে কেটে গুটিয়ে গেল।

চন্দ্রভূষণবাবু বললেন—না। ইস্কুল খোলা থাকবে। ইস্কুল চলবে। আপনারা যে যার ক্লাসে গিয়ে বসুন। কেষ্ট—যেমন তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিয়ে থাকিস—দিয়ে যাবি! ইস্কুল চলবে।

এগিয়ে এলেন সেকেণ্ড-মাষ্টার, বললেন—কিছু মনে করবেন না মাষ্টারমশাই, একটা কথা বলব।

—বলুন।

—আপনি ইনষ্টিটিউশনের হেড, আপনার কথা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তাতে ফল কি হবে? সারাটা দিন শূন্য ক্লাসে বসে না হয় আমরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম কি বই পড়েই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু হাস্যকর হবে না দেখতে?

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। গৌরবর্ণ তরুণ, দীপ্ত চোখ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, ধারালো নাক, ঠোঁটের রেখায় কি যেন একটা চাপা অভিপ্রায় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে, প্রশস্ত কপালের ঠিক মাঝখানে ছুটি ভুরুর মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম কুঞ্চন দেখে মনে হয়, সে অভিপ্রায় ক্ষুব্ধ, সে অভিপ্রায় অপ্রসন্ন, সে সংকল্প রূঢ়।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে আপিসে আসুন সীতেশবাবু। আপনারা—। অন্য মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা ক্লাসে যান।

বলেই অভ্যাসমত দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি এসে আপিসে ঢুকলেন। নিজের চেয়ারের সামনের চেয়ারখানি দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

সীতেশবাবু হেসে বললেন—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন? এ ধর্মঘটে আমি উৎসাহ দিয়েছি! কথা শেষ করে তিনি আবারও একটু হাসলেন।

চন্দ্রভূষণবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সন্দেহ নয় সীতেশবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। এ ধর্মঘট আপনি করিয়েছেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সীতেশবাবু। তারপর বললেন—হ্যাঁ, করিয়েছি। অবশ্য একা আমি নই। আপনার প্রাক্তন ছাত্র এখানকার মাননীয় ব্যক্তিও আছেন।

—তাও জানি। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে যে খেলা খেলছেন—তাতে তাদের ক্ষতির কথা ভেবে দেখেছেন?

খেলার কথা নয় মাষ্টারমশাই। খেলা আমরা করিনি, করেছেন আপনি। আপনিই তাদের খেলনা ভেবেছেন। কিন্তু তারা তা নয়।

—খেলনা তাদের আমি কখনও মনে করিনি সীতেশবাবু। তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা আমার কাছে সবাই ব্রজকিশোর। তাদের মানুষ, সত্যকারের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই। আজ উনপঞ্চাশ

বছর ইস্কুল হয়েছে। প্রথম এ ইস্কুল যখন গড়ে তোলা হয় তখন মাধববাবুর কাছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থেকেছি; তাঁকে টাকা খরচ করতে রাজী করিয়েছি। এখানকার সমাজপতিদের দোরে দোরে ঘুরেছি। মাটির ঘর তুলে ইস্কুল হ'ল প্রথম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটিয়েছি। এই ইস্কুল আমার হাতে গড়া। এখানকার ষাটের নিচে যাদের বয়স—তারা আমার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করে আসুন, তারা বলবে—আমার কাছে তারা সন্তান ছিল, খেলনা ছিল না। কোনদিন ভাবিনি। আজও ভাবিনে।

—তা হলে সেকালের ছেলেরা সত্যিই খেলার মত নির্জীব ছিল। তাই তাদের নাড়াচাড়া করে ছেলেদের খেলনা ভাবা আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে মাষ্টারমশাই। আজকাল কাঠের পুতুলেরা কাল-ধর্মে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে। আপনার অভ্যস্ত ধরণের নাড়াচাড়া তারা সহ্য করতে পারছে না। তাদের একটা নতুন জাগরণ হয়েছে—তারা নতুন পথে চলতে যাচ্ছে—তাদের আপনি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ জানোয়ারের মত আটকাতে চাইলে থাকবে কেন?

—সেটা আপনি আসবার পর থেকেই হয়েছে সীতেশবাবু। আপনি জাগিয়েছেন তাদের।

হেসে সীতেশবাবু বললেন—আপনি আমাকে যে কম্প্লিমেণ্ট দিলেন—সে আমার চিরদিন মনে থাকবে মাষ্টারমশাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—কিন্তু 'ঈশ্বর না-মানা' এ জাগরণ না উন্মত্ততা? এ শিক্ষা কি আপনি দেননি?

—না।

—আমার বিশ্বাস ছিল আপনি সত্য বলতে ভয় পাবেন না।

—আমি অসত্য বলিনি।

—আপনি এসে যে ময়দান ক্লাব করেছেন—মাঠে যে ছেলেদের নিয়ে জটলা করেন, সেখানে কি নিয়মিত এই বক্তৃতা দেননি ?

—দিয়েছি। কিন্তু সে ইস্কুলের বাইরে। ইস্কুলে আমি এ শিক্ষা কোনদিন দিইনি।

—আমরা কিন্তু ইস্কুলের ভিতরে এক শিক্ষা বাইরে অন্য শিক্ষা কখনও দিইনি, সীতেশবাবু।

—সত্য শিক্ষা যখন ইস্কুলে দেওয়া নিষিদ্ধ হয় মাষ্টারমশাই, দেওয়ার যখন উপায় থাকে না—তখন ইস্কুলের ভিতরে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এভাবে ছাড়া, করার উপায় কি ? আমি অন্যায় করিনি।

—সত্য বাদ দিয়ে সত্য শিক্ষা ? হাসেন চন্দ্রভূষণবাবু।—ঈশ্বর বাদ দিয়ে সত্য ?

—আপনার সঙ্গে তর্ক করব না মাষ্টারমশাই। ছেলেদের দাবী আপনি মেনে নিন। নইলে এ ষ্ট্রাইক মিটবেনা।

—রিলিজিয়াস ক্লাস—স্তোত্রপাঠ এ আমি উঠিয়ে দেব না। নেভার !

—অপশোনাল করে দিন।

—না। তাও দেব না। তাতে ইস্কুল উঠে যায়—উঠে যাক।

—তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত—। হাসলেন সীতেশবাবু—হাসির ইঙ্গিতের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত কি হবে সে কথাটা উহ্য রয়ে গেল।—আমি ক্লাসে যাচ্ছি। বলে হাসতে হাসতে সীতেশবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

হেড-পণ্ডিতমশায়ের পায়ের শব্দে তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশায় মৃদুস্বরে বললেন—কাঁদছেন আপনি ?

চোখের চশমাটা খুলে চোখ মুছে চন্দ্রভূষণবাবু ঈষৎ হেসে বললেন —ব্রজকিশোরের মৃত্যু-দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়। সন্ধ্যেবেলা তার ঘরে ঢুকেছিলাম—এমনি সাজানো ঘর-দোর—শুধু কেউ ছিল না, আর ওই ঘড়িটার মত সেদিনও টাইমপিসটা টিক্ টিক্ করে চলেছিল।

পণ্ডিতমশায় আবার বললেন—চলুন, আপিসে চলুন। বলেই তিনি ডাকলেন—কেষ্ট—ওরে, অ কেষ্ট!

কেষ্ট মণ্ডল ইস্কুলের পুরানো চাকর ও হেডমাষ্টার, হেড-পণ্ডিত, মৌলবীর সমসাময়িক। পণ্ডিতমশায় রসিকতা করে বলেন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য যতদিন—কেষ্ট আমার ততদিন।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন বলেন—ওরে বামনা—তা হলে বলছিস তুই চন্দ্র আর হেডমাষ্টার সূর্যি—আর আমিটা বুঝি কেউ নই? আমিও যে তোদের বয়সী রে বামনা!

পণ্ডিতও মৌলবীকে গাল দেন। বলেন—ওরে দেড়েল মামদো —বয়সে এক হলে কি হবে—তুই যে অনেক পরে এসেছিস। পারসী কেলাস পাঁচ বছর পরে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তোর সঙ্গ?

পণ্ডিত এবং মৌলবীতে এমনি গাঢ় প্রীতির রস মাখানো ঝগড়া চিরকাল চলে আসছে। টিফিনের সময় কল্কেতে ফুঁ দিত কেষ্ট, মৌলবী বলতেন—এই কেষ্ট, বামনাকে আগে দিবি না। উ টানলে আর কিছু থাকবে না!

পণ্ডিত হুঙ্কার দিতেন—খবরদার দাড়িয়াল মামদো! তুই তামাক খেতেই পাবিনে। তুই তামাক খাবি কি?

—কেন রে মাকুন্দা তিলক মার্কা বামনা—তামাক খাব না কেন?

—ওরে মুখ্যু, তোকে তামাক খেতে নেই। বিচার করে দেখনা!

—শুনি, তোর বিচারটা।

—শুনবি ?

—বল্ ।

—তুই মরে গোরে যাবি, কি না ?

—হ্যাঁ, যাব।

—আমি মরে চিতায় পুড়ব, কি না ?

—পুড়বি। তোর চিতের আগুন নিভবে না বামনা। তোদের রাবণের মত। সে আমি বলে দিলাম।

—নিশ্চয়। হরদম তামাক সাজব আর খাব রে দেড়েল। আমাকে সেইজন্যেই তামাক খেতে আছে। তুই যাবি গোরে—কোথায় পাবি আগুন ? কি করে তামাক খাবি ? খাসনে, বদ অভ্যেস করিসনে ; মরবি, মামদো হয়ে পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে তোর।

কেষ্ট হাসত।

চন্দ্রভূষণবাবুই কেষ্টকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর গ্রামের লোক কেষ্ট। কেষ্ট মণ্ডল। ইস্কুল হয়েছে আজ উনপঞ্চাশ বৎসর আগে। চন্দ্রভূষণবাবু এসেছিলেন এখানে সেকেণ্ড-মাষ্টার হয়ে। সঙ্গে এসেছিল কেষ্ট। কিশোরীমোহন কাব্যতীর্থ তখন শুধু কাব্যতীর্থ—হেড-পণ্ডিত হয়েই এসেছিলেন। আগামী বৎসর ইস্কুলের পঞ্চাশ বৎসর—গোল্ডেন জুবিলী—স্বুবর্ণ জয়ন্তী ; কিশোরীমোহন পণ্ডিত, কেষ্ট এবং মৌলবী জিয়াউদ্দিন সেই অপেক্ষাতেই আছেন ; জয়ন্তীর সময়েই অবসর নেবেন। চন্দ্রভূষণবাবুও হেডমাষ্টারের পদ থেকে অবসর নেবেন কিন্তু আচার্য হয়ে থাকবেন ; তাঁর জন্য নূতন পদের সৃষ্টি হবে। আগেকার আমল হলে আচার্য না বলে বলত স্বুপারিনটেণ্ডেণ্ট। জয়ন্তীর আয়োজন চলছে। পুরানো ছাত্রদের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লেখা হচ্ছে। উনপঞ্চাশ বছরে তো কম ছাত্র এ ইস্কুলে পড়েনি ! অন্তত কয়েক হাজার। চাঁদা তোলা হচ্ছে। একটি সাধারণ সভা

ডেকে জয়ন্তী কমিটি তৈরী হয়েছে, কয়েকটি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। অনেক আয়োজন।

চন্দ্রভূষণবাবুর প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। তাঁর কাব্য তখন তিনি পড়েননি, পড়েছেন পরবর্তী জীবনে। এবং বৃদ্ধ বয়সেও সে কাব্য তিনি কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। জয়ন্তীর আয়োজনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর মনে একটি লাইন গুন গুন করছে ঃ "অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন।"

করতে হবে, করতে হবে; অনেক কষ্টেগড়ে তুলেছেন নবগ্রাম হাই ইংলিশ ইস্কুল—এখনকার নাম নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ। ব্রজকিশোর মারা গেছে, নবগ্রাম ইস্কুল বেঁচে আছে ; নবগ্রাম ইস্কুল তাঁর আর এক সন্তান। যাক—তাই যদি উঠে যায়—তাই যাক।

ব্রজকিশোর মরে গেছে—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠও উঠে যাক। সত্তোর বছর বয়সে তাও সইবে। কিন্তু রিলিজিয়াস ক্লাস আর স্তোত্র-পাঠের ব্যবস্থা তিনি তুলে দিতে পারবেন না। কখনও না। নিজের হাতে প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি এই ইস্কুল গড়ে তুলেছেন।

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বৎসর। একুশ বছরের সদ্য ডিষ্টিংশনে বি-এ পাশ চন্দ্রভূষণবাবু সরকারী চাকরী খোঁজেননি—নবগ্রামে এসে ইস্কুল করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গড়ে তুলেছেন, ঊনপঞ্চাশ বৎসর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ করেছেন। ইস্কুলের প্রথমদিন থেকেই ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে। গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্র ঃ

ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

ইস্কুলে এখন সাড়ে তিন শো ছাত্র। একটা হলে সব ছেলেদের সঙ্কুলান হয় না, সেই জন্য স্কুলের মাঠে ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় —মাষ্টাররা দাঁড়ান সামনে ইস্কুলের সিঁড়ির উপর; চারটি ছেলে এই স্তোত্র গান করে—বাকী ছেলেরা তাদের পরে সমস্বরে সেই সুরে স্তোত্র গান করে যায়। চন্দ্রভূষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। সমস্ত দিনের জন্য মনের তারে সুর বেঁধে নেন। ১৯০৫ সালে ইস্কুলে কোন মুসলমান ছাত্র ছিল না। সাত সাল থেকে মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে আরম্ভ হয়েছিল। তারা এতে কোন আপত্তি জানায়নি; তারা তখন পারসী পড়ত না, সংস্কৃত পড়ত। দশ সাল থেকে পারসী ক্লাস আরম্ভ হয়েছে, জিয়াউদ্দিন এসেছেন দশ সালে। জিয়াউদ্দিন শুধু পারসীই জানেন না—তিনি সংস্কৃতও জানেন। তিনিও আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থায় আপত্তি জানাননি। মুসলিম লীগ আমলে মুসলমান ছাত্ররা আপত্তি জানিয়েছিল, তাতে জিয়াউদ্দিন বলেছিলেন, ওরে বাবা, পঞ্চামৃত দিয়ে হিঁদুরা ঈশ্বরের ভোগ দেয়। তাতে দুধ থাকে, দই থাকে, মধু থাকে, ঘি থাকে, চিনি থাকে—সে কি ঈশ্বরের ভোগ দিয়েছে বলে—অখাদ্য হয়? খেলে বিস্বাদ লাগে? না—দেহের ক্ষেতি করে? ও যখন খেতে মিঠা তখন খেয়ে নে।

ছেলেরা শোনেনি, রাগ করেছিল মৌলবীর উপর। নাম দিয়েছিল —জেয়াউদ্দিন ভট্‌চাজ্‌। সে সময় চন্দ্রভূষণবাবু মুসলমান ছেলেদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন থেকে তারা আলাদা অন্য জায়গায় কোরাণের প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে আসছে।

আর রিলিজিয়াস ক্লাস; শনিবারই ইস্কুলের নিয়মিত ক্লাসের পর আধ ঘণ্টা ধর্মসভা বা রিলিজিয়াস ক্লাস হয়। হিন্দুর আলাদা— মুসলমানদের আলাদা। এ ব্যবস্থা ষোল বছরের। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর থেকে। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর আঘাত তিনি আর সহ্য

করতে পারছিলেন না। পৃথিবী শূন্য মনে হয়েছিল। জীবন অর্থহীন ভেবেছিলেন, পৃথিবীর আলো নিভে গিয়েছিল, তিক্ত ছাড়া স্বাদ ছিল না পৃথিবীতে, কটু ছাড়া গন্ধ ছিল না, দুঃখ ছাড়া আর কিছু ছিল না সৃষ্টিতে। ইস্কুলে এসে বসে থাকতেন—চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত, ক্লাসে পড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন—মিনিট দুই পরে উঠে চলে আসতেন, আপিসে এসে তখনকার সেকেণ্ড-মাষ্টারকে পাঠিয়ে দিতেন—আপনি যান ননীবাবু—আর পারছি না। পারলাম না।

চন্দ্রভূষণবাবু সেই সময় গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন সান্ত্বনা কিসে? কোথায়?

মহাকবি পুত্র-শোকাতুর প্রৌঢ়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

বুঝতে পারেননি চন্দ্রভূষণবাবু। পরদিন প্রভাতে উপাসনা-মন্দিরে ছিল একটি বিশেষ উপাসনা। কবিগুরু সেদিন নিজে গিয়েছিলেন। চন্দ্রভূষণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সে উপাসনাসভা গানে আরম্ভ।

সে গান আজও তাঁর মনের তারে অহরহ ঝঙ্কৃত হচ্ছে:

“তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ—সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না।—
তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে॥”

আনন্দের সন্ধান—আনন্দের ধ্যানমন্ত্র চন্দ্রভূষণবাবু সেইখানে বসেই পেয়ে গিয়েছিলেন। উপাসনার পর মহাকবির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি। ধ্যানমন্ত্র ধ্যানপদ্ধতি আমি পেয়েছি। ফিরে এসে তিনি প্রতি শনিবার ইস্কুলের পর শান্তিনিকেতনের উপাসনা-আসরের অনুকরণে এই ধর্মসভার প্রবর্তন

করেছিলেন। গান দিয়েই আরম্ভ। তারপর হিন্দুর উপনিষদ পুরাণ, ইসলামের কোরাণ,কৃশ্চানের বাইবেল থেকে কিছু কিছু পাঠ করা হয়।

এতকাল পর ছেলেরা বলেছে—এ ব্যবস্থা চলবে না।

বিদ্রোহ করেছে তারা।

তাদের কয়েকজন নিঃসংশয়ে না কি জেনেছে—ঈশ্বর নেই। তাদের সে কথা জানিয়েছেন—নিঃসংশয়ে বুঝিয়েছেন এই নবীন বিদেশী শিক্ষকটি। সেকেণ্ড-মাষ্টার—সীতেশবাবু।

এই তো মাসখানেক আগে ছোট একটি ছেলে—দশ এগার বছরের শিশু—কাঁদোকাঁদো মুখ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর কোয়ার্টারের বাইরের ঘরের দরজায় উঁকি মারছিল। চন্দ্রভূষণবাবু ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে তামাক খাচ্ছিলেন চেয়ারে বসে। ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি সরে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

হেডমাষ্টার তিনি। গাম্ভীর্য তাঁকে অভ্যাস করতে হয়েছে। গাম্ভীর্য তাঁকে রাখতে হয়। দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ বছরের প্রথম দু বছর তিনি ছিলেন সেকেণ্ড-মাষ্টার, তারপর তিনিই হয়েছিলেন হেডমাষ্টার। তেইশ বছর বয়সের হেডমাষ্টার সাতচল্লিশ বৎসর আগে। তখন ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদেরই অনেকের বয়স ছিল উনিশ কুড়ি। স্কুলের দ্বিতীয় বৎসরে বরদা পণ্ডিত এণ্ট্রান্স দিয়েছিল ; নর্ম্যাল পাশ করে বরদা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে এসেছিল ; বরদার বয়স ছিল চব্বিশ। বরদা দাড়ী রেখেছিল, বড় বড় দাড়ী গোঁফ নিয়ে সে ক্লাসে বসে থাকত। চণ্ডীপুরের দুই ভাই নলিন আর নরেন উনিশ বছর বয়সে দাড়ী গোঁফ নিয়ে মাইনর পাশ করে এসে ভর্তি হয়েছিল ফোর্থ ক্লাসে। শম্ভু, ষষ্ঠী, ফুরু, গুলু, ভোলা, হলা, নবীন এই নবগ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে ; ব্রাহ্মণ, ভূসম্পত্তিবান্ কুলধর্মে তান্ত্রিক, আবার ইংরিজী ফ্যাশনে ঘাড় চেঁচে চুল ছাঁটত—একটার জায়গায় দুটো সিঁথী চিরে

টেরী কাটত। সেই সব ছেলেদের শৃঙ্খলাধীনে রাখতে তাঁকে গাম্ভীর্য অভ্যাস করতে হয়েছিল। নিজের দীর্ঘ দেহের জন্য তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন। একে বয়স অল্প, তার উপর যদি তিনি মাথায় খাটো হতেন—তবে অভ্যাস করলেও গাম্ভীর্য তাঁকে মানাত না। হেডমাষ্টার হয়ে তিনি দাড়ী রেখেছিলেন। গোঁফ সেকালে কেউ কামাত না। কাপড় কামিজ কোট ছেড়ে তিনি চোগা-চাপকান পরতেন। তাতে আরও লম্বা দেখাত, আরও গম্ভীর মনে হ'ত। ইস্কুলের প্রথম ঘণ্টাতেই তিনি বের হতেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রতিটি ক্লাসে ঢুকতেন। প্রতিটি ক্লাস দেখে আপিসে ফিরে আসতেন। গাম্ভীর্য যা একদিন আবরণ ছিল, মুখোস ছিল—সেইটেই আজ জীবনে আসল চেহারায় দাঁড়িয়ে গেছে।

সেকালে ব্রজকিশোর যখন ইস্কুলে ভর্তি হ'ল ছেলে বয়সে তখন সে বাড়ী এসে তাঁকে বলত—ইস্কুলে আপনাকে দেখে এমন ভয় লাগে!

হেসে বেশ একটু অহঙ্কার অনুভব করেই তিনি বলতেন—লাগে?

—বড্ড ভয় লাগে!

এবার সশব্দে হেসে উঠতেন তিনি। কিন্তু একটু শব্দ করে হেসেই নিজেকে সংযত করতেন। ছেলের যদি ভয় ভেঙে যায়, সে যদি ইস্কুলেই আবদার ক'রে পিতৃস্নেহ দাবী করে অন্যদের চেয়ে বেশী—তবে সে যে অপরাধ হবে তাঁর! ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

আজ বৃদ্ধ বয়সে প্রাণটা কেমন করে। ব্রজকিশোর বেঁচে থাকলে—তাঁর ছেলেদের দিয়ে খানিকটা ছেলেমানুষী করতেন। তাঁর গাম্ভীর্যের মুখোসটা—যেটা অহরহ পরে থেকে থেকে—আসল মুখেই পরিণত হয়ে গেল, সেটা তারা টান মেরে ছিঁড়ে দিতে পারত!

একটু সকরুণ হাসি দেখা দিল মুখে।

পারত কি? তারাও কি এই ইস্কুলে পড়ত না? অন্ততঃ ইস্কুলে যাওয়ার সময় তারাও ঠিক এই শিশুটির মতই সঙ্কুচিত হ'ত।

ছেলেটি আবার উঁকি মারলে। মুখখানি যেন কেমন কেমন! তিনি ডাক্‌লেন—কেষ্ট!

কেষ্ট তাঁর বই খাতা গুছিয়ে দিচ্ছিল। সে তাঁর দিকে তাকাল।

—দেখ তো একটি ছেলে—উঁকি মারছে। চশমা নেই ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু মনে হ'ল—মুখখানা শুকনো শুকনো। হয় তো শরীর খারাপ করেছে—কি বাড়ীতে কিছু হয়েছে—ছুটি চায়—দেখ তো!

কেষ্ট বেরিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে এল।

সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। মুহূর্তে চিনলেন—এবার আপার প্রাইমারি থেকে বৃত্তি পেয়ে ক্লাস ফাইভে এসে ভর্তি হয়েছে—এই গ্রামেরই শ্যামাদাসের ছেলে সুকুমার। শ্যামাদাস তাঁর ছাত্র। অকৃতি ছাত্র। কিন্তু এ ছেলেটি উজ্জ্বল—এ ছেলে কৃতি হবে—সে ছাপ যেন ওর মুখে লেখা আছে। সুন্দর আবৃত্তি করে, সুন্দর গান করে, স্তোত্র গানের ধরতাই ধরে, যারা—তাদের মধ্যে সুকুমার একজন।

কেষ্ট বললে—কি বলছে বুঝতে পারলাম না। কি বলছে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে—শুধান আপনি।

—কি রে সুকুমার? কি হয়েছে?

—স্যার—

—বল, কি হয়েছে?

—ঈশ্বর নেই স্যার?

—কি! ঈশ্বর নেই? অবাক বিস্ময়ে ছোট ছেলেটির প্রশ্নটির পুনরুক্তি করা ছাড়া আর কোন উত্তরই বৃদ্ধ খুঁজে পেলেন না!

—ওরা বলছিল স্যার। বলছিল—বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে ঈশ্বর নেই। সেকেণ্ড স্যার অনেক বিজ্ঞান প'ড়েছেন—তিনি বলেছেন যারা বলে ঈশ্বর আছেন—তারা ভুল বলে, নয় মিথ্যে বলে। বলছিলেন—এইবার স্তোত্রপাঠ আর ধর্ম কেলাস উঠে যাবে। উঠিয়ে দেবেন?

চমকে উঠলেন চন্দ্রভূষণবাবু। পা থেকে রক্ত উঠতে লাগল মাথার দিকে। বৃদ্ধ বয়সের শীতল রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠছে যেন। তিনি সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—সেকেণ্ড স্যার বলেছেন! চন্দ্রবাবু হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তুই শুনেছিস?

—না স্যার, ওরা বলছিল ময়দান ক্লাবে বলেছেন। ওদের কাছে বলেছেন।

—ওরা কারা?

—ফার্ষ্ট ক্লাসের জীবেনদা, ভূপেনদা।

—সেকেণ্ড ক্লাসের দীপু, ফিনা,—

চন্দ্রবাবু নিজেই নামগুলো করে গেলেন—অনেকগুলো নাম।

—হ্যাঁ স্যার! আবার সে প্রশ্ন করলে—ক্লাস উঠে যাবে, স্যার? ঈশ্বর নেই স্যার?

ছেলেটির করুণ মুখচ্ছবি দেখে চন্দ্রভূষণবাবুর চোখ দুটি হঠাৎ এক মূহূর্তে জলে ভরে গেল! সে জল তিনি মুছলেন না—ছেলেটির পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—না, ক্লাস উঠে যাবে না। আর ঈশ্বর নেই এ কি কখনও সত্য হয়? আমি তাঁকে বুকের ভিতর বুঝতে পারি রে। তুইও তো নিজেই বুঝতে পারছিস। পারছিস নে? নইলে তোর মনে এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

—হ্যাঁ স্যার!

—যা, স্তোত্রপাঠের জায়গায় যা। ঘণ্টা পড়বে। আমি যাচ্ছি।

সুকু চলে গিয়েছিল।

জীবেন, ভূপেশ, দীপু, ফিনা, নিতু—সীতেশবাবু এদের পিছনে। তিনি না জানা নন। কিন্তু এতটা অনুমান করতে পারেননি।

কৃতি ছাত্র, উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা, শিক্ষকতায় অসাধারণ দক্ষতা—সীতেশের। এখানে এসেছিল সাময়িকভাবে। পুরানো সেকেণ্ড-

মাষ্টার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন, ছ মাসের ছুটি; সীতেশকে এনে দিয়েছিল—তাঁরই পুরানো ছাত্র, সে এখন বিখ্যাত লোক, খ্যাতনামা সাংবাদিক। সীতেশের দক্ষতা দেখে দীপ্তি দেখে—কর্মক্ষমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেকেণ্ড-মাষ্টার বাঁচলেন না, তিন মাসের মধ্যেই মারা গেলেন; তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সীতেশকে স্থায়ী সেকেণ্ড-মাষ্টার নিযুক্ত করলেন। ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম করেছিল—তখন তিনি খুসী হয়েছিলেন। তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন ময়দান ক্লাবের। আশেপাশের সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করে সেখানে গিয়ে ক্লাবের অধিবেশন হয়। আবৃত্তি হয়, গান হয়, মুখে মুখে রচনা করে অভিনয় হয়। সীতেশ বক্তৃতা করে, ছেলেরাও করে।

হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি অনুভব করলেন—শীতের রাত্রে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটি যেটির উত্তাপ আরম্ভে প্রাণ-সঞ্জীবনী বলে মনে হয়েছিল, সেটি যেন অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিস্তার লাভ করতে উদ্যত হয়েছে।

আগুনটায় খোঁচা দিয়েছিলেন—কিশোরী পণ্ডিত।

ফার্ষ্ট ক্লাসের জীবেন কবিতা লেখে, গল্প লেখে। তার ধাতুরূপের খাতা সংশোধন করবার সময় খাতার পাতায় একটা কবিতার খসড়া দেখতে পেয়েছিলেন হেডপণ্ডিত। আজকালকার কবিতা তিনি বোঝেন না, ছন্দ নেই, মিল নেই—অর্থ করতে গেলে মনে হয় অথৈ জলে ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিজের নাম বাপের নাম—সব ভুলে যাচ্ছেন। তবুও জীবেন লিখেছে—কি লিখেছে পড়ে দেখেছিলেন। কিঞ্চিৎ রসিকতা করবার অভিপ্রায় ছিল। কিশোরী কাব্যতীর্থ রসিকতায় বিখ্যাত। কিন্তু কবিতা পড়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে খাতাটা দুমড়ে টেবিলের উপর আছড়ে মাড়িতে মাড়িতে ঘষে—অল্পক্ষণ স্থির হয়ে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—

—অ বাবা গোপাল, অ জীবেন—শোন তো মাণিক।

পণ্ডিত কবিতাটা দেখেছেন বা পড়েছেন এটা জীবেন বুঝতে পারেনি। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—অঁ—। কাছে এস গোপাল—বুকে নি পরাণটা জুড়িয়ে নি। আহা গোপাল রে!

—কি বলছেন স্যার?

—বলছি—আমার চোদ্দ পুরুষের ছেরাদ্দ করে তোমার ছাপ্পান্ন পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা আমার বরাহ-গোপাল—তুমি কোন্ পচা বিল থেকে ধম্মশালুক ফুল তুলে চিনেছ বাবা মাণিক? এ কি লিখেছ? এঁ্যা? কি?

হে নূতন যুগের মানুষ বিধাতা—
তোমার আবির্ভাবে—
ধর্মের ভণ্ডামির পাল্লা হল শেষ।
কুৎসিৎ কুচক্রের চক্রান্তের দাঁতালো চক্রের
দাঁতগুলো ভেঙে গেল; কুবলয় হাতীর
দাঁত টেনে যেমন ভেঙেছিল কৃষ্ণ—
তেমনি তুমি দিলে ভেঙে চক্রান্তের চাকার দাঁত।
অনাচার-শোষণ পীড়ন এই দাঁতগুলো।
জেরুজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
তোমার আবির্ভাবে ভেঙে পড়ল—পড়ছে—পড়বে।

আর পড়তে পারেন নি। দারুণ ক্রোধে আবার টেবিলের উপর খাতাটা আছড়ে—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোর জ্যাঠাকে পড়িয়েছি, বাবাকে পড়িয়েছি, তোর ঠাকুরদাদা আমাকে দাদা বলত। তোর ঠাকুমা এমন ভালো মানুষ—ওরে শুদ্ধচারিণী মানুষ! অরে—অ পেল্লাদ অরে অ—বরাহ-গোপাল—ধম্মের শালুক চিনতে গিয়ে শুধু

পাঁক ঘেঁটে এলি বাপ—আর ফতোয়া দিলি শালুক ফুলের গন্ধ পাঁকের গন্ধ, বর্ণ পাঁকের বর্ণ, পাপড়িগুলোও পাঁকের ? বলিহারি বাপ—কুলকজ্জল—বৈজ্ঞানিক-গবেষণাটা করেছিস ভালো ; ওরে ও বরাহ—তোর ঠাকুরদাদার বাবা যে পণ্ডিত মানুষ ছিলেন—গুরুগিরি করতেন ; তোর ঠাকুরদাদা ছিল পূজোরী বামুন। তোর বাপ জ্যাঠাকে পূজোর দক্ষিণে—আর আতপ-বেচা পয়সায় রিংজী খ শিখিয়েছিল রে—মানে ইংরেজী ইংরেজী !

জীবেন থৈ হারিয়ে যেন অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছিল—প্রত্যুত্তরে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না ; শেষ পর্যন্ত মরিয়ার মত বলেছিল—বিজ্ঞান মিথ্যে বলে না। সে ঠাকুরদাদাই হোক আর তার বাপই হোক—বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোতে তাদের সত্য চেহারাই ধরা পড়েছে।

এবার খাতাখানা পণ্ডিতমশাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন—বলেছিলেন—দাঁড়া হাত ধুয়ে আসি। পরের ঘণ্টাতেই তিনি এসে চন্দ্রভূষণবাবুকে বলেছিলেন—সর্বনাশ সমুৎপন্ন মাষ্টার-মশাই—অর্ধেক ত্যাগ করলেও আর রক্ষা নাই ! ওটাকে তাড়ান ইস্কুল থেকে। জীব্‌নেটাকে।

চন্দ্রভূষণবাবু হেসে বলেছিলেন—ওরা ছেলেমানুষ, আজকাল সাহিত্যে যা দেখছে—কাগজে যা পড়ছে—সেইটেই ফ্যাশনের মত অনুকরণ করছে। ও হয় তো কোন আধুনিক কবির অনুকরণ করেছে। ওর ওপর এতটা জোর দেওয়া আপনার ঠিক হয়নি।

—উঁহু। উঁহু ! ভেবে দেখুন আপনি ! ভেবে দেখুন ! চলে গিয়েছিলেন পণ্ডিত নিজের ক্লাসে।

তাতেও চন্দ্রভূষণবাবু হেসেছিলেন। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে খানিকটা এমন উগ্রতা খুবই স্বাভাবিক। আর জীবেন ? এই তো বছরখানেক আগে আগমনী কবিতা লিখেছিল—ইস্কুলের হাতে-লেখা ম্যাগাজিনে ঃ

চিন্ময়ী তুমি মৃন্ময়ী হলে—হও মা এবার জীবন্ময়ী।

ভক্তি ও বিশ্বাসের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল সে কবিতায়। পণ্ডিতমশায় ভুল করেছেন—আকাশের রক্তাভ দেখে ঠাউরেছেন—দিগন্তে আগুন লেগেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমাজের রূপান্তরে—দুঃখ পেয়েছেন। মুখের উপলব্ধির আনন্দের হাসিটুকু মুহূর্তে কৌতুকহাস্যে রূপ নিয়েছিল, একটি সরস:রসিকতা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল, পণ্ডিত-মশায় নিজেই এই রসিকতাটি করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেরা পরীক্ষার সময় কোশ্চেন কঠিন হয়েছে বলে আপত্তি করে; বেশী করে ফেলকরা ছেলেরাই। পণ্ডিত বলেন—ভালো করে অনুধাবন করে দেখ বৎস! রক্তসন্ধ্যা—বাবারা—রক্তসন্ধ্যা। ঘরে আগুন লাগেনি। কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে! দুবার পড়। পড়লেই দেখবে—জল অথৈ নয়—এক হাঁটু—দিব্যি পার হয়ে যাবে হেঁটে। আঃ ঘর পুড়ে পুড়ে তুই বাবাদের মন চকাভকা হয়ে আছে! জানিসতো ঘর-পোড়া গরু রক্তসন্ধ্যে দেখেও ভাবে ঘরে আগুন লেগেছে। কবার গৃহদগ্ধ হয়েছে বাবা ধূর্জটির বাহন?

—মানে ষাঁড়!

ওই রক্তসন্ধ্যার উপমাটা দিয়ে রসিকতা করবার কথায় তাঁর মনে কৌতুক জেগে উঠেছিল। ঠিক এই মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকেছিলেন—সেকেণ্ড-মাষ্টার সীতেশবাবু। তাঁর পিছনে জীবেন-ভূপেশ-দীপু-ফিনা-পিণ্টু-নিতু। সীতেশবাবুর মুখের হাসিতে কখনও ভাটা পড়ে না; ঠোঁট দুটির কিনারা পরিপূর্ণ করে হাসিটি ছলছল করে। তিনি বলেছিলেন—এই নিন মাষ্টারমশাই—ছেলেরা আপনার কাছে এসেছে। ওদের মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। পণ্ডিতমশাই সাধুভাষায় ওদের কটুবাক্য বলেছেন—মানে গালাগালি করেছেন;

ওদের বিশ্বাসে আঘাত করেছেন। আপনার সামনে আসতে ওরা ভয় পাচ্ছিল—আমি শুনে ওদের নিয়ে এলাম। আপনি শুনুন ওদের কথা!

উপলব্ধির আনন্দ—রসিকতার কৌতুক—মুহূর্তে একটা চকিত আশঙ্কার ঝাঁকি খেয়ে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল; মনে হয়েছিল সামনের চেয়ারে ঝুলানো তাঁর গলার পাকানো চাদরটা অকস্মাৎ সাপ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, ঝুলে থাকা মুখটার কয়েকটা সুতো বাতাসে কাঁপছে—সে যেন সুতো নয়—সাপটা চেরা জিভ নাড়ছে।

পরমুহূর্তে তিনি আত্মসম্বরণ করে গম্ভীরভাবে ছেলেদের বলেছিলেন—ওয়েল কাম ইন্! ছেলেরা এসে বাড়িয়ে দিয়েছিল একখানা গুটনো ফুলস্ক্যাপ কাগজ। দরখাস্ত।

সীতেশবাবু হেসেই বলেছিলেন—আমিই বললাম—মুখে বলতে তোমাদের গোলমাল হবে—লিখে আন। লিখেই এনেছে ওরা।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলেন—আপনার ক্লাস নেই? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল—নেই, এ ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম। তিনি দরখাস্তখানি নিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। দরখাস্তে শুধু অভিযোগই নয়—এ অভিযোগের প্রতিকারে তাদের দাবীও তারা জানিয়েছে। অভিযোগ—পণ্ডিত মশায়ের বলা ঘটনার থেকে অনেক বেশী। অনেক বিকৃত। এ ঘটনাই একমাত্র অভিযোগের কেন্দ্র নয়।

'পণ্ডিতমশায় বৃদ্ধ হয়েছেন—তিনি নিতান্তই সেকেলে মনোভাব সম্পন্ন। তিনি পাঠ্যবিষয় অবহেলা করে অধিকাংশ সময় একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করে গল্প বলে থাকেন। অনেক গল্প তাঁর একালের রুচিতে অশ্লীল!' এ ছাড়া আজকের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ—'জীবেনের বিজ্ঞান বিশ্বাসে তিনি আঘাত করেছেন। তিনি তার বাপ পিতামহ প্রপিতামহ তুলে ব্যঙ্গ করেছেন।' এবং

আরও অনেক সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে ছোট অভিযোগ। 'সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে তিনি ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন; বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিন্দা করে থাকেন। তিনি ইংরাজী জানেন না। ফলে ইংরাজী সংস্কৃত অনুবাদে তাদের অসুবিধা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।' দাবী করেছে—'এর প্রতিকার চাই।' ইঙ্গিতে বলেছে পণ্ডিতমশায়ের স্থানে তারা যোগ্যতর একালের পণ্ডিত চায়। প্রত্যক্ষ দাবী করেছে—জীবেনকে তার পিতামহ প্রপিতামহ তুলে যে ব্যঙ্গ করেছেন—তা তাঁকে প্রত্যাহার করতে হবে।

পড়তে পড়তে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দুই কানের পাতা গরম হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দরখাস্তখানির মধ্যে কোথাও যেন বাঁধনের এতটুকু শিথিলতা নাই; নিপুণ গ্রন্থিতে গাঁথা, নিপুণ রচনায় রচিত, সর্বোপরি প্রথম পংক্তি থেকে শেষপর্যন্ত কোথাও একবিন্দু বেদনা নাই, আছে ক্ষোভ,—ঔদ্ধত্য।

চোখ তুলে তিনি ছেলেদের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখের দিকে তারা তাকাতে পারছে না, মাটির দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের অন্তরের উত্তাপ তিনি অনুভব করলেন। এমন উত্তাপ ছেলেদের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মধ্যে মধ্যে অনুভব করেছেন। কত মতিভ্রান্ত বিকৃত প্রকৃতির ছাত্র নিয়েই না তিনি এই ইস্কুল চালিয়ে এলেন! তাদের শাসন করেছেন—নিজের অন্তরে দুঃখ পেয়েছেন। কত সময় এক একজনের আচরণে তিনি রাগে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। আবার নিষ্ঠুর বেদনায় চোখে জল এসেছে। রাত্রে ঘুম হয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছেন। কিন্তু এমন দলবদ্ধ ছাত্রের যুদ্ধের আহ্বান তাঁর কাছে এই নতুন এই প্রথম।

আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ঊনপঞ্চাশ

বছরের মধ্যে আজও পর্যন্ত ইস্কুলে কখনও ছাত্ররা বা কোন ছাত্র এই-ভাবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেনি। তোমরা প্রথম।

ছেলেরা চুপ করেই ছিল, কোন উত্তর দেয়নি।

তিনি আবার বলেছিলেন—পণ্ডিতমশায়ের চেয়ে যোগ্য সংস্কৃত শিক্ষক অবশ্যই আছেন, কিন্তু আজও আমি দেখিনি। আজ পর্যন্ত এ ইস্কুল থেকে যত ছেলে সংস্কৃতে ষ্টার পেয়েছে—অন্য কোন বিষয়ে তত ছেলে ষ্টার পায়নি।

আবার তিনি বলেছিলেন—গত বছরের পরীক্ষার ফলেও তাই হয়েছে। সংস্কৃতে চারটি ছেলে ষ্টার পেয়েছে। পাঁচটি ছেলে ফেল হয়েছে—তার মধ্যে একটি ছেলে সংস্কৃতে ফেল করেছে। আমি কি করে তোমাদের কথা মানব যে, পণ্ডিতমশায় বৃদ্ধ হয়ে অক্ষম হয়েছেন! তিনি বৃদ্ধ, তিনি অবশ্যই সেকালের লোক। মনোভাব সেকেলে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তোমাদের কথাই মেনে নিয়ে বলছি—তাঁর সঙ্গে যদি সম্বন্ধ হয় পাঠ দেওয়া আর নেওয়ার—পড়ার আর পড়ানোর, তা হলে তাঁর মনোভাব নিয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? তিনি একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করেন? অশ্লীল রসিকতা করেন?

উত্তেজনায় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন।

—আমি প্রত্যাশা করিনি। এ আমি—। তোমরা পণ্ডিত-মশায়ের টিকি ফোঁটা মালা নিয়ে যেসব মন্তব্য কর, তাঁকে অসভ্য বর্বর বল—সে আমি জানি। তিনি অশ্লীল রসিকতা করেন? তিনি—!

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্ষোভে ক্রোধে।

—তিনি ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন? এও একটা অভিযোগ? ওঃ! তোমরা ধর্ম মান না? ঈশ্বর মান না? বিজ্ঞান মান? তোমরা কতটুকু পড়েছ বিজ্ঞান? তোমরা প্রত্যেকটি ছাত্র যে যে পরিবারে জন্মেছ—মানুষ হচ্ছ—তার প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্মাচরণ রয়েছে,

ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে, পূজা রয়েছে—পার্বণ রয়েছে। তোমরা বলেছ—দাবী জানিয়েছ—সে সব উঠিয়ে দিতে? সংস্কৃত ভাষা ধর্মদর্শন ধর্মজীবন নিয়ে সমৃদ্ধ—সেই তার প্রাণশক্তি; সে ভাষা শিক্ষা দিতে ধর্মশিক্ষা দেন তিনি এটাও তাঁর অপরাধ?

ছেলেগুলোর মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল।

সীতেশবাবু মাথা হেঁট করে কিছু লিখেই যাচ্ছিলেন। এদিকের আলোচনায় তাঁর যেন কোন আকর্ষণই ছিল না। এবার হঠাৎ মুখ তুলে সেই হেসেই বললেন—বিচারটা একটু একপেশে হয়ে যাচ্ছে মাষ্টারমশাই। ধর্ম-বিচারেও একালে সেকালে অনেকটা প্রভেদ হয়নি কি? রাবণের দশটা মাথা কুড়িটা হাত—এসেকালে যেমন বিশ্বাস করত—একালেও তাই করে কি? সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যাও কি বদলায়নি? একটা মানুষের মস্তিষ্কে দশটা মানুষের বুদ্ধি, দেহে দশটা মানুষের শক্তি—এই ব্যাখ্যা কি চলছে না আজ? বানর বলতে—সত্যিকারের বানরকে ছেড়ে কি আমরা তাদের অনার্য জাতি বলে ব্যাখ্যা করছি না?

কথাগুলি শেষ করেই তিনি লেখা কাগজখানা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতেই বলেছিলেন—আমাকে মাফ করবেন। আমি বোধহয় অনধিকার-চর্চা করেছি।

বলেই তিনি বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

হেডমাষ্টারমশায় আত্ম-সম্বরণ করে ছেলেদের বলেছিলেন—আমি মনে করি, মহাকাব্য পুরাণ এ পড়তে গেলে তাতে যা আছে তাই মেনে নিয়ে পড়তে হবে। তার মধ্য থেকেই তার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হবে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অদগ্ধ অক্ষত দেহে কেউ ফিরে আসতে পারে কি না এ বিচার করে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পড়া চলে না। কিন্তু সে থাক।

তিনি বলেই চলেছিলেন—জীবেনের সঙ্গে যা হয়েছিল পণ্ডিত-মশায়ের সে আমি শুনেছি। পণ্ডিতমশাই আমাকে বলেছেন।

ব্যাপারটার মূল সেখানেই। জীবেন বিজ্ঞান বিশ্বাস করে ভালো কথা। কিন্তু কাপ্মী জগন্নাথের মন্দির ভাঙবার কল্পনাটা ভালো কথা নয়। পণ্ডিতমশায় তাতেই বোধ করি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমিও ক্ষুব্ধ হতাম। কারণ, গতবার জীবেন পূজোর কাগজে আগমনী কবিতা লিখেছে। গত সরস্বতী পূজোতে সব থেকে বেশী নেচেছে। জীবেনদের বাড়ীতে আমি জানি শালগ্রাম শিলা আছেন। আর জীবেন—তুমি কি বলেছ—যে বিজ্ঞানের সত্য-সন্ধানী আলোয় তুমি তোমার প্রপিতামহ পিতামহের সত্য চেহারা দেখতে পেয়েছ? অর্থাৎ ভণ্ড চেহারা বা ঐ রকম ধরণের চেহারা—ধর্মের নামে তাঁরা যজমানদের উপর অত্যাচার করতেন? পণ্ডিতমশায় তো এই নিয়েই তোমার পিতামহ প্রপিতা-মহের কথা বলেছেন?

জীবেনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল।

চন্দ্রবাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—কাঁদছ? কেঁদো না! যাও, ক্লাসে যাও। যা সম্পূর্ণ বোঝনি—জাননি—তাই নিয়ে চর্চা করতে গিয়েছ, ঠকেছ। এখন শেখ, পড়, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। পড়ে যাও। কবিতা লেখ—যা জান তাই নিয়ে। আর একটা কথা বলে দি। পণ্ডিতমশায়ের মত ভালোমানুষ—শুদ্ধ মানুষ—এ আমি দেখিনি। এবং ধর্মকে ঘৃণা করবার আগে তাকে অবিশ্বাস করবার আগে তাকে ভালো করে জানো, বোঝো। তার মূলকে সন্ধান করো। তারপর অবিশ্বাস হলে ছেড়ে দিয়ো। যাও!

সেদিন শেষ ঘণ্টায় সমস্ত ইস্কুলের ছাত্রকে সমবেত করে তিনি বলেছিলেন—ওই কথাগুলোই। ছাত্রদের কর্তব্য বুঝিয়েছিলেন।

ঠিক তার দুদিন পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, জীবেনদের দলটি স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর ইস্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকছে। শনিবারে ধর্মের ক্লাসে দেখলেন জীবেনরা নেই, চলে গেছে।

এটা তাঁর অসহ্য হয়েছিল।

আজ উনপঞ্চাশ বছর ধরে স্তোত্রপাঠ বাধ্যতামূলক। ষোল বছর ধরে চলে আসছে ধর্মসভা। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন বুঝেছেন—এর মধ্যে আছে পবিত্রতা-নম্রতা-পরিচ্ছন্নতা-শুভ্রতা। আছে শান্তি, আছে তৃপ্তি, আছে প্রসন্নতা, আছে শুচিতা। অন্ধ বিশ্বাসের কথা নেই, লোকাচারের বন্ধন নেই, পীড়ন নেই। আজও পর্যন্ত কোনদিন কোন ছাত্র এতে আপত্তি করেনি, ইচ্ছা করে দেরী করে আসেনি অনুপস্থিত হবার জন্য ; ইচ্ছা করে কেউ চলে যায়নি বিনা অনুমতিতে।

পরের সোমবারে তিনি আপিসে বসেই ডাকলেন—কেষ্ট!

কেষ্ট এসে দাঁড়াতেই বললেন—এই ছেলেদের ডেকে নিয়ে এস। নাম-লেখা কাগজ হাতে তুলে দিলেন।

জীবেনরা এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আজ এক সপ্তাহ তোমরা স্তোত্রপাঠের সময় থাক না কেন? জীবেন!

—আসতে দেরী হয়ে যায় স্যার।

—সে তো ইচ্ছে করে!

চুপ করে রইল ছেলেরা।

—ধর্মসভাতেও তোমরা ছিলে না এ শনিবারে।

এবার জীবেন বললে—আমাদের ভালো লাগে না।

—হোয়াট?

—আমরা বিশ্বাস করি না ধর্মে।

—কিন্তু এ স্কুলে এ কম্পালসারি। আজ আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। দিস ইজ দি সেকেণ্ড টাইম। তৃতীয়বারে আমি ক্ষমা করব না।

আবারও সেদিন তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন—তিনি নিজে যা বুঝেছেন—জেনেছেন। যা বুঝে যা জেনে তিনি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর এতদিনের শিক্ষক-জীবনে এর ফল যা পেয়েছেন তাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমাকে বিশ্বাস করো। আমি বলছি তোমাদের। ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি যত খারাপ—বিজ্ঞান নিয়ে গোঁড়ামিও তেমনি খারাপ। তোমরা কতটুকু শিখেছ, কতটুকু জেনেছ?

ছেলেরা উত্তর দেয়নি। চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল। সেই চুপ করে থাকাটাই তাদের উত্তর। সেটা বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি। তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—তা না হলে এ ইস্কুলে তোমাদের পড়া চলবে না। এই আমার শেষ কথা! যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল।

এর পর দিন-কয়েক তারা নিয়ম মতই স্তোত্র-ক্লাসে এসেছিল। তিনি খুসী হয়েছিলেন।

হঠাৎ সুকুমার ছেলেটি সেদিন এসে তাঁকে প্রশ্ন করলে—ধর্মসভা—স্তোত্র-পাঠ উঠে যাবে স্যার? ঈশ্বর নাই? জীবেন দা—ভূপেশ দা'রা বলছে! ওরা উঠিয়ে দেবে!

তিনি বলেছিলেন—না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি স্কুলে পাঠিয়ে নিজে আপিসে বসে কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন কি করবে ওরা। ওরা শিক্ষা-বিভাগে দরখাস্ত করবে। স্তোত্রপাঠ—ধর্মসভা শিক্ষা-বিভাগের পাঠ্য-সূচীর বাইরের জিনিস। সুতরাং ওসবে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে তিনি পারেন না। তিনি স্থির করলেন—সরকারী গ্র্যাণ্ট তিনি ছেড়ে দেবেন। নিজে তিনি মাইনে নেবেন না। মাইনে তিনি আজ ষোল বৎসরই এক রকম নেননি। নিজের মাইনের টাকা দান করে তিনি বিভিন্ন ফাণ্ড খুলেছেন। ব্রজকিশোরের নামে তিনি

বৃত্তি স্থাপন করেছেন। বিশ্ববিত্থালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে ছু বছরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিয়ে থাকেন। ছুটি গরীব ভালো ছেলের বোর্ডিংয়ের খরচ তিনি দিয়ে থাকেন। প্রাক্তন দরিদ্র শিক্ষকদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করেছেন—তাতে মাসিক কুড়ি টাকা তিনি চাঁদা দেন। থাকবে, এ সব এখন থাকবে। বিনা সরকারী সাহায্যেই তিনি ইস্কুল চালাবেন। মাষ্টারমশায়দের বলবেন—তাঁরা নিশ্চয় তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তিনি লড়াই করবেন। ভগবানের নাম নিয়ে তিনি ইস্কুল আরম্ভ করেছিলেন। ভগবানের নাম তিনি উঠিয়ে দিতে দেবেন না।

সীতেশবাবুকে ডেকে তিনি বললেন—আপনাকে একটা অনুরোধ করব, সীতেশবাবু।

—বলুন।

—আপনার ময়দান ক্লাব আপনি বন্ধ করুন।

—বন্ধ করব ?

—হ্যাঁ। আমি এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাইনে, শুধু বলতে চাই এটা আপনি বন্ধ করুন।

সীতেশবাবু বললেন—ক্লাব আমি উদ্যোগী হয়ে গড়ে দিয়েছি কিন্তু ক্লাব আমার নয়, ক্লাব ছেলেদের। বন্ধ করা না-করা তাদের ইচ্ছায় নির্ভর করে মাষ্টারমশাই। আপনি বলছেন—আমি যোগ দেব না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। আমি প্রেসিডেণ্ট আছি—ছেড়ে দেব।

সেইদিনই রাত্রে তিনি খবর পেলেন—স্থকুমারকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে জীবেনরা কয়েকজনে।

হেড পণ্ডিতমশাই খবর নিয়ে এলেন।

সন্ধ্যার পর বোর্ডিং ইনস্‌পেকশন করে চন্দ্রভূষণবাবু ঘরে বসে এই সব কথাই ভাবছিলেন। উনপঞ্চাশ বছর কত বিচিত্র চরিত্রের ছেলে

দেখে এলেন। আজ উনিশ শো পাঁচ সালের নবগ্রাম। সমাজ বিকৃত—ধর্ম বিকৃত ছেলেরা বারো বছর না-পার হতেই তামাক ধরত। অধিকাংশই তখন বর্ধিষ্ণু-ঘরের উঁচু জাতের ছেলে।

হৃষিকেশ দুটো সিঁথি চিরে টেরী কেটে আসত। মাঝখানের চুল গুড়িয়ে পাকিয়ে রাখত। তার মধ্যে রাখত সে বার্ডশাই লুকিয়ে। বার্ডশাই সে পকেটে রাখত না।

চণ্ডীপুরের সরোজাক্ষের দেড় হাত লম্বা ভালো কলি হুঁকো ছিল। এক একদিন তিনি কেষ্টকে নিয়ে ছেলেদের ঘর-বাক্স খানাতল্লাস করতেন। দশ বারোটা হুঁকো, দেড় সের দু সের তামাক, কল্কে টিকে নিয়ে আসতেন। সরোজাক্ষ ভাত খাবার পর চীৎকার করে কেঁদেছিল —মরে যাব! আমি মরে যাব!

চীৎকার শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন—কি হ'ল?

—পেটে যন্ত্রণা। মরে যাব! আমি মরে যাব!

উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ডাক্তার ডেকেছিলেন।

সরোজাক্ষকে দেখে ডাক্তার বলেছিলেন—ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই বোধহয় তামাক খায়, মাষ্টারমশাই। তামাক খেতে পায়নি আজ, তাই মানসিক যন্ত্রণা—সত্যিসত্যিই বোধহয় দেহের যন্ত্রণায় দাঁড়িয়েছে। ওর তামাক চাই।

কেষ্টকে ডেকে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেষ্ট, যাও, ওর হুঁকোটা বেছে ওকে দিয়ে এস। তামাক সেজেই নিয়ে যাও।

কেষ্ট যাচ্ছিল—সরোজাক্ষের হুঁকো নিয়ে। তিনি আবার ডেকে বলেছিলেন—হুঁকোগুলো সবই নিয়ে যাও।

পরদিন তিনি তামাক খাওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিজেও তামাক ছেড়ে দিয়েছিলেন। তামাক খাওয়া জীবনে তাঁর বিলাস ছিল।

নবগ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় মেলা হয়। মেলায় সাতদিন মেতে

থাকত উরু। মেলার আগের দিনই উরু মাথায় সাবান দিয়ে চুল রুক্ষ করে—বগলে রসুন চেপে ইস্কুল এসে বলত—জ্বর হয়েছে স্যার। ধরতে পারলেন না প্রথম প্রথম। ভাবতেন সত্যিই জ্বর হয়েছে উরুর।

সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিৎ কেলেঙ্কারী করেছিল এখানকার বর্ধিষ্ণু ধনীর ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় কিন্তু সে ভালো ছেলে। তিনি তাকে বেত মেরে জর্জরিত করে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

নবগ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলেরা ছিল উদ্ধত, সম্পদের অহঙ্কারে যত অহঙ্কৃত—তত ছিল তাদের পড়ায় অবহেলা। তাদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এর জন্য নবগ্রামের ভদ্র-সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁকে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি কোনদিন নতি স্বীকার করেননি। কোনদিন না।

ইস্কুলের দুঃসময় গেছে। সে দুঃসময়ের হেতুর অন্যতম হেতু এই নবগ্রামের ভদ্র-সম্প্রদায়ের ছেলে। উনিশ শো ষোল সালে গৌরীকান্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ছেলেটির। সাময়িকভাবে ইস্কুলের এড্ বন্ধ হ'ল। তিনি পুলিশের কাছে বলেছিলেন—গৌরীকান্তকে তিনি জানেন, ভালো করে জানেন, এমন অপরাধ সে করেনি। করতে পারে না। তবে মানুষের সেবা-ধর্ম যদি অপরাধ হয়—সে অপরাধ গৌরীকান্ত করেছে।

নবগ্রামের ওই একটি ছেলে। গৌরীকান্তকে স্মরণ করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। গৌরীকান্তর জন্য পুলিশের ভয়ে অনেক ছেলে ইস্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে সময়। তার উপর স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল সেবার অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। আঠারোটি ছেলের মধ্যে চারটি ছেলে মাত্র পাশ করেছিল। ইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা দু শো থেকে নেমে এল এক শো কুড়ি-পঁচিশে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে নতুন হাই ইস্কুল হ'ল। সেদিন তিনি ভিক্ষার ঝুলি

তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে, আর হাতে নিয়েছিলেন কলম ; সাধারণের কাছে ভিক্ষা ক'রে ইস্কুল চালিয়েছিলেন—সরকারের সঙ্গে এড্ বন্ধের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। দু বছর পর সে এড্ আদায় করেছিলেন। একসঙ্গে দু বছরের টাকা। সেই টাকায় ইস্কুলের নতুন বাড়ী হয়েছিল। নতুন বাড়ীর জন্য তিনি কয়লার ব্যবসায়ী ছাত্রদের কাছে ইট পোড়াবার কয়লা ভিক্ষা করেছিলেন, এখানে যারা ইট পাড়ে পোড়ায় —তাদের বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন—এই ইস্কুলে তোমাদের ছেলেদের পড়ার সুবিধে করে দেব, হাফ ফ্রি করে দেব। তোমাদের কম মজুরীতে ইট পুড়িয়ে দিতে হবে। দিয়েছিল তারা। এ স্কুলের—। চন্দ্রভূষণ-বাবু ঘরখানার চারিদিক চেয়ে দেখলেন। প্রতিটি ইট দেখে দিয়েছেন —নরম ইট আধপোড়া ইট তিনি বেছে বেছে ফেলে দিতেন।

ওই ইস্কুলের আয়রণ চেষ্ট !

ওটা হয়েছে উনিশ শো আঠারো সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জরিমানার টাকায়। ছেলেরা টেষ্টের কোশ্চেন চুরি করেছিল। প্রতিটি ছেলের দশ টাকা হিসেবে জরিমানা করেছিলেন। পরীক্ষার খাতা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন—কোশ্চেন জেনে ছেলেরা উত্তর লিখেছে।

তিনি ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন—আমি বলছি—তোমরা আমার পা ছুঁয়ে বল। সত্য কথা বল।

স্বীকার করেছিল ছেলেরা।

তিনি বলেছিলেন—আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি নিতে হবে তোমাদের। ভবিষ্যতে যাতে ছেলেরা আর চুরি করতে না পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। সাজা দিতেই হবে। দশ টাকা করে ফাইন দিতে হবে প্রত্যেককে।

দুটি গরীব ভালো ছেলের ফাইনের টাকা তিনি নিজে দিয়েছিলেন।

নবগ্রামের বাবুদের ছেলে ছিল একটি—তাকে তিনি এ্যালাও করেননি। আর করেননি বোর্ডিংয়ের একটি ধনীর ছেলেকে। এরাই ছিল পাণ্ডা, এবং পড়ায় ছিল কাঁচা। তা নিয়েও অনেক ক্ষোভ হয়েছিল। তাতে তিনি হার মানেননি। কোন আপোষ করেননি।

ব্রজকিশোরের সঙ্গেও তিনি আপোষ করেননি। একমাত্র ছেলে ব্রজকিশোর।

তিনি আপোষ করবেন না। কখনও না। কিছুতে না।

চন্দ্রভূষণবাবু ডাকলেন—কেষ্ট!

—আজ্ঞে!

—আলো নিয়ে সঙ্গে এস। দেখ, হেড পণ্ডিতমশায় কোথায়। ডাক তাঁকে, স্থকুমারকে দেখতে যাব আমি।

—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ, রাত্রেই যাব।

হাসলেন তিনি। রাত্রি আর দিন! কেষ্ট বুড়ো হয়েছে, ভুলে গেছে। রাত্রি বারোটায় সংবাদ পেয়েছেন, গ্রামান্তরে একটি ভালো ছেলের কঠিন অস্থখ! তিনি দেখতে গেছেন। কেষ্টই সঙ্গে গিয়েছে। ডাক্তার নিয়ে গেছেন। বোর্ডিংয়ের ছেলের টাইফয়েড, রাত্রে দুবার গিয়ে খবর নিয়েছেন। কতদিন এমনি উঠে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে বোর্ডিংয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। ঘরে আলোর ছটা পেয়ে ডেকেছেন—এতরাত্রে আলো জ্বেলে কি করছ? পড়ছ? না। অস্থখ করবে, শুয়ে পড়। নিজের হাতে আলো নিভিয়ে দিয়ে এসেছেন। ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল তিনটে মাস—নিয়মিত নিত্য তিনি বোর্ডিংয়ের ঘরে ঘরে কান পেতে শুনে আসেন, আজও আসেন। তখন সন্ত ঘর ছেড়ে আসে নতুন ছেলেরা। ভর্তি হয়। প্রথম প্রথম নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে! মা

ছেড়ে আসে! রাত্রে ঘুম আসে না। সকলে ঘুমিয়ে গেলে তারা কাঁদে। অস্ফুট কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে মাকে ডাকে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তিনি ডেকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। এককালে নবগ্রামের পথে বের হোতেন তিনি। ছেলেদের আড্ডাখানাগুলি জানা ছিল তাঁর। তাস চলত, পাশা চলত। গল্প হৈ-চৈ করত গ্রামের ছেলেরা। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতেন—

—অনেক রাত্রি হয়েছে কিশোরী। ঘুমিয়ে পড়। No more boys, no more.

বলেই চলে আসতেন। কোথাও শুধু গলা ঝেড়ে সাড়াটুকু দিয়েই চলে আসতেন।

সুকুকে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে।

খেজুরের ডাল দিয়ে পিঠখানা প্রায় রক্তাক্ত করে দিয়েছে। লম্বা রক্তমুখী দাগে পিঠখানা ক্ষতবিক্ষত।

স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সুকু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চন্দ্রভূষণবাবুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। বার্ধক্যের পীত পাণ্ডুর দীপ্তিহীন চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। হেড পণ্ডিতমশায় ভয় পেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর এ দৃষ্টি অন্যে চেনে না, তিনি চেনেন।

ব্রজকিশোরকে চন্দ্রভূষণবাবু যেদিন বলেছিলেন—বেরিয়ে যা তুই, ঘর থেকে বেরিয়ে যা। সেদিন তিনি তাঁর চোখে এই দৃষ্টি দেখেছিলেন।

নবগ্রামের বাবুদের একটি ভালো ছেলেকে সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিত ব্যবহারের জন্য হলে দাঁড় করিয়ে বেতের ঘায়ে জর্জরিত করে

দিয়েছিলেন যেদিন—সেদিন এই দৃষ্টি তাঁর চোখে তিনি দেখেছিলেন। হেড পণ্ডিত সভয়ে ডাকলেন—মাষ্টারমশাই !

চন্দ্রভূষণবাবু কথার উত্তর দিলেন না। দীর্ঘ পদক্ষেপে নীরবে ইস্কুলে ফিরে এলেন তিনি।

পরের দিন স্তোত্রপাঠের পরই তিনি বললেন—তোমরা হলে এসে দাঁড়াও। কেষ্ট ! আমার বেত নিয়ে এস।

—জীবেন চ্যাটার্জী, ভূপেশ গাঙ্গুলী, দীপেন মিত্র, নিতু দত্ত ! দাঁড়াও এদিকে এসে। কেষ্ট টুল দাও চারখানা। দাঁড়াও তোমরা টুলের উপর !

পণ্ডিতমশায় শিউরে উঠলেন—চন্দ্রবাবুর চোখে সেই দৃষ্টি !—মাষ্টারমশাই ! মাষ্টারমশাই !

গ্রাহ্য করলেন না চন্দ্রবাবু।

এ অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করবেন না। আপোষ তিনি করবেন না।

সেকেণ্ড-মাষ্টার এগিয়ে এলেন।—মাষ্টারমশাই !

—Please, Please আমার কর্তব্যে আপনি বাধা দেবেন না, সীতেশবাবু।

বেত মেরেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাদের ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। এ ইস্কুলে তাদের স্থান তিনি দেবেন না। কখনও না, কিছুতে না। আদর্শের বিপক্ষে কখনও তিনি আপোষ করেননি। একটা সংঘর্ষ তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন—জীবেন ভূপেশ ছেলেদের পাণ্ডা, নবগ্রামের ছেলে, ছেলেদের তারা মাতাতে পারে, প্রয়োজন হলে ভয় দেখাতে পারে, মেরে সাজা দিতে পারে। জীবেন কবিতা লেখে বলে ছেলেদের প্রিয়ও বটে। তার উপর সীতেশবাবু আছেন পিছনে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড হতে পারে এ সংঘর্ষ, এ তিনি কল্পনা

করতে পারেননি। হোক—সে সংঘর্ষ হোক কল্পনাতীত, তবু তিনি আপোষ কব্বেন না।

উঠে পড়লেন তিনি চেয়ার থেকে।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ল। তাঁর ক্লাস নাইনে ইংরিজীর ক্লাস। চেম্বার্স ডিকসনারী, নোটের খাতা, ইংরিজী সিলেকসন নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

প্রকাণ্ড হল ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। হলের মাঝখান দিয়েই পথ।

সেই ঘড়ির পেণ্ডুলামের টক্ টক্ শব্দটা ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্রির স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ওই শব্দটার মধ্যে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বুক চিরে বেরিয়ে এল। ব্রজকিশোর নেই—ইস্কুল—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ—এও থাকবে না? কি নিয়ে থাকবেন তিনি? পরমুহূর্তেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন নিজেকে শক্ত করে তুললেন। না—যাক। আদর্শের জন্য তিনি ব্রজকিশোরকে ত্যাগ করেছিলেন—আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠকে বাঁচিয়ে রাখতে চান না। দীর্ঘপদক্ষেপে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। ব্রজকিশোর এম-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। নবগ্রামের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার গোপন গাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল। এই ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই বন্ধুত্ব। তিনি এটা পছন্দ করতেন না। ব্রজকিশোরের অনুরাগের কারণ বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি। নবগ্রামের সম্পন্ন ঘরের সন্তানগুলির প্রধান আকর্ষণ তাদের পোশাক, তাদের রুচি, তাদের চালচলন। তিনি বলতেন—খোলস। ঈশপের সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের গল্প পড়েছ? অবশ্য গর্দভ সকলে নয়, খাঁটি সিংহও দু একজন আছে। এবং চামড়া গায়ে গর্দভের স্থলে নেকড়ে চিতাবাঘও আছে, তবুও ওদের সঙ্গে সঙ্গ করোনা, ওদের পথ আমাদের পথ এক

নয়। ওরা চায় সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। আর কিছু না। আমি চাই সত্যকারের বিদ্যা। তোমাকে তাই চাইতে হবে। নবগ্রামের বাবুরা জাতে ব্রাহ্মণ কিন্তু কাজে ওরা ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের পেশা নিয়েছে। ওরা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ আমরা। কায়স্থ হয়েও তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমাকে সেই ব্রাহ্মণ হতে হবে।

ইস্কুল-জীবনে ব্রজকিশোরকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ব্রজকিশোর অবশ্য গোপন বন্ধুত্ব গোপন রাখতেই পেরেছিল, অতি সুকৌশলে—গোপন রেখেছিল। একদিনের জন্যও ব্রজকিশোর ওদের গায়ের গন্ধ গায়ে নিয়ে আসেনি, কোনদিন ওদের বর্ণাঢ্য জামা কাপড়ের ছাপ ওর গায়ে দেখতে পাননি। কখনও বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ পাননি, ব্রজকিশোরের জামার রঙের সঙ্গে ওদের পোশাকের সাদৃশ্য দেখেননি। সেই ব্রজকিশোর কলকাতায় কলেজে পড়তে গেল। ডিষ্টিংশনের সঙ্গে বি-এ পাশ করলে। এম-এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল। হঠাৎ একদিন গুজব শুনলেন—ব্রজকিশোর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবগ্রামের সুরেনের সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করতে নেমেছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এও সম্ভব? ব্রজকিশোর—তাঁর কল্পনার ব্রজকিশোর—? তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায়! নিজের চোখে যাচাই করে—দেখে আসবেন।

কলকাতায় পৌঁছে ইউনিভারসিটি ঘুরে ব্রজকিশোরের বাকী মাইনে এবং অনুপস্থিতির দিনের হিসেব নিয়ে তার মেসে এসে উঠেছিলেন। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। তখনও ফেরেনি ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের দরজায় একটা কাঠের বোর্ড টাঙানো ছিল—কোল-মার্চেণ্ট ব্রোকার কোলিয়ারি-এজেণ্ট। তিনি আর দাঁড়াননি, একখানা কাগজে তাঁর নাম লিখে চাকরের হাতে দিয়েই চলে এসেছিলেন।

তারপর ব্রজকিশোরের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপ। পত্রে ব্রজকিশোর লিখেছিল—আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত ইস্কুল-মাষ্টারী করিতে বাধ্য করিবেন বলিয়াই আমি এম-এ পড়া ছাড়িয়াছি। ইস্কুল-মাষ্টারী আপনার যত ভালোই লাগুক আমার ভালো লাগে না। আপনি জীবনে যাহাকে বিলাস বলেন আমি তাহাকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আপনি দুঃখের মধ্যে আনন্দ অনুভব করেন—ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনে গৌরব অনুভব করেন—সে অনুভূতি আমার নাই, আমি দুঃখকে দুঃখই বলি—কষ্ট পাই ; ত্যাগের অপেক্ষা অর্জনের গৌরবকে আমি ছোট মনে করি না। আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহপূর্বক আমার স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন, আমার সে বয়স হইয়াছে। আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি।

তিনি আপিসে বসেই তার উত্তর লিখেছিলেন—যে পথ তুমি বাছিয়া লইয়াছ সে পথ ও আমার পথ বিপরীতমুখী। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা হইবে না—এটা তুমি ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিয়াই পত্র লিখিয়াছ বলিয়া মনে করি। অতঃপর যে পত্র তুমি আমার পাইবে—জানিবে সে পত্র আমার শেষ শয্যায় শুইয়া লেখা পত্র।

পণ্ডিত কিশোরীমোহন সচকিত হয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন—মাষ্টারমশাই !

পত্র লেখার মধ্যে চন্দ্রভূষণবাবু এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে—পণ্ডিত কখন এসেছিলেন—জানতেই পারেননি।

চোখ তুলে চন্দ্রভূষণবাবু বলেছিলেন—পণ্ডিতমশাই !

—কি হয়েছে মাষ্টারমশাই !

—কিছু হয়নি তো !

—হয়েছে। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। এমন মূর্তি এমন দৃষ্টি তো কখনও আপনার দেখিনি ! কি হয়েছে—বলুন ?

চন্দ্রবাবু চিঠি দুখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। চিঠি দুখানা পড়ে পণ্ডিত বলেছিলেন—কিন্তু এ কি পত্র আপনি লিখলেন? না—না—।

—ঠিক লিখেছি। দিন।

—না—না—মাষ্টারমশাই!

—ওর মুখ আমি দেখব না পণ্ডিতমশায়। সেই মৃত্যুকালে যদি ও আসে—তো—। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলন আমি খবর পেয়েছি, ব্রজকিশোর মগ্য পান করতে আরম্ভ করেছে। সুরেনদের ফার্ম থেকে হোটেলে সায়েবদের পার্টি দিয়েছিল, সেই পার্টিতে—। নিজের চোখে দেখেছেন এমন মানুষ আমাকে বলেছেন।

পত্রখানা উল্টোদিক থেকে সত্য হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যু-শয্যায় দেখতে আসার বদলে ব্রজকিশোর নিজে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তাঁকে দেখা দিতে এল। টাইফয়েডে আক্রান্ত ব্রজকিশোরকে সুরেন এসে পেঁাছে দিয়ে গিয়েছিল। ব্রজকিশোর কেঁদেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল তাঁর কাছে। বলেছিল—আমি ভালো হয়ে উঠে আবার কলেজে ভর্তি হব।

ব্রজকিশোরের মৃত্যু হয়েছিল ভোর রাত্রে। সেবা যারা করছিল তারা তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে। তিনি শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। অকস্মাৎ জীবন-দীপ নিভে গেল। অত্যন্ত নিঃশব্দতার সঙ্গে—অগোচরে তিনি তাকিয়ে থেকেও ঠিক বুঝতে পারেননি; ঠিক দিন শেষে রাত্রি নামার মত। আলো ম্লান হয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে—তারপর হঠাৎ যে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে রাত্রি নামে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি। তিনি বুঝতে পেরে চারদখানি টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিতমশায় ছিলেন তাঁর পাশে। তিনিই প্রথম জেগেছিলেন।

আর্তস্বরে তিনি ডেকে উঠেছিলেন—মাষ্টারমশাই! কি হ'ল? কিশোর? কিশোর?

মৃদুস্বরে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—নেই। চলুন ইস্কুলের সিঁড়িতে গিয়ে বসি।

ইস্কুলের সিঁড়িতে দুজনেই নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। নিস্তব্ধ শেষ রাত্রি, বায়ুস্তরে অন্ধকারে—পৃথিবীর সর্বাঙ্গে অণু-পরমাণুতে অনেক স্তব্ধতা, ক্লান্তি! তারই মধ্যে তাঁরা যেন ডুবে যাচ্ছিলেন, হারিয়ে যাচ্ছিলেন। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনিই প্রথম বলেছিলেন—সিঁড়িগুলো বড় কম চওড়া। পুরনোও হয়েছে, ফেটেছে। এবার ভেঙে সিঁড়িগুলো বেশ চওড়া করে করাতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার বলেছিলেন—গোড়াতে প্ল্যান তো ভালো হয়নি, অনেক খুঁত থেকে গিয়েছে। এ সবগুলো ভেঙে-চুরে এবার ঠিক করতে হবে।

পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন—ইস্কুলের কথা এখন থাক মাষ্টারমশাই।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—ব্রজকিশোর গেল—এখন এই ইস্কুলই সম্বল রইল পণ্ডিতমশায়। বুড়ো বয়সে খেতেও দেবে। দেবে না? অক্ষম হলেও আমাকে একটা পেনসন দেবে না? তা দেবে। ইস্কুলেই দেহ রাখব, ছেলেরাই সৎকার করবে, ওরাই শ্রাদ্ধ করবে। ওর কথা ছাড়া আর কোন্ কথা কইব?

একটু হেসেছিলেন।

আজ সেই ইস্কুল—! সেও কি—?

নিস্তব্ধ হলে ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করে চলছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্রির কথা। ঠিক তেমনি।

সামনে ক'মাস পরেই গোল্ডেন জুবিলী!

হঠাৎ তিনি ঘুরলেন। বারান্দায় এসে খড়খড়িতে ঝোলানো পেটা

ঘণ্টাটার ফাঁস থেকে কাঠের হাতুড়িটা খুলে নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

মাষ্টারেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন—কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে! ওই ছেলেরা নিশ্চয়! ওদের দুষ্ট বুদ্ধির কি সীমা-পরিসীমা আছে। পণ্ডিত বলতে বলতেই এলেন—পাষণ্ডের দল সব! হতভাগারা! কুষ্মাণ্ড কোথাকার!

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। হেডমাষ্টার ঘণ্টা বাজাচ্ছেন!

—ছুটি। কেষ্ট দরজা বন্ধ কর।

আপিসে এসে তিনি কাগজ টেনে লিখতে বসলেন।

পণ্ডিত বললেন—ইস্কুলের লম্বা ছুটি দিয়ে দেবেন বোধহয়। নয় তো বন্ধ!

*　　*　　*　　*

না।

চন্দ্রবাবু রেজিগনেশন লেটার লিখছিলেন। চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। সেই পোষাকেই দীর্ঘপদক্ষেপে বেরিয়ে পড়লেন পথে। সেক্রেটারীর বাড়ী।

ছেলেরা ফিরে আসুক—ইস্কুল বাঁচুক। আমার আদর্শ ওরা মানছে না, আমার কাল গত হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি—ইস্কুল বাঁচুক।

সেক্রেটারী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এ কি হয়।

—হয়। তাই নিয়ম। এই হবে।

—সামনে জুবিলী?

—হবে। করবে ওরা।

—অন্তত ততদিন থাকুন!

—না।

মাষ্টারেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেকেণ্ড-মাষ্টার বললেন—উনি তো রইলেনই। কাছেই ওই বাড়ী।

হাসলেন চন্দ্রবাবু। বিচিত্র হাসি।

জুবিলী হয়ে গেল সেদিন। কিন্তু চন্দ্রবাবু আসেননি। তিনি কাশীতে চলে গেছেন। তাঁর পত্র একখানি এসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন লেখা, একটু বদল করে দিয়েছিলেন—

যখন আমার চরণ চিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে—
তখন নাই বা মনে রাখলে!

হুটু মোক্তারের সওয়াল

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মর্মস্থলনিবাসী কীটের মত এক-একটা সমারোহের আনন্দ-কোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা! কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষে হুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণা, কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহুবিস্তৃত এবং বহুপ্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না, কোন বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কঙ্কণায় নাকি মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন্ অতীতকালে মা-লক্ষ্মী ওই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধূলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটি হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ানো আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের

ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জেদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়। কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণার বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এমন একখানি ধনীর গ্রাম, তবুও গ্রামে না আছে স্কুল, না ডাক্তারখানা, এমন কি হাটবাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান-ছুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা বাতাসা ছাড়া, আর কোন কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোন মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন, মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে!

দোকানী বলে, আজ্ঞে, সবই ধার, রেখে কি করব বলুন? খাজনায় আর কত কাটানো যাবে? তা ছাড়া আমার দোকানে বাকি বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন, হাট তো হ'ল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি; মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে! স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, সর্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব? ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসানো হবে না।

ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই-ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তিতর্ক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন—সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়িখানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙিন কাগজের মালায় মণ্ডপ

সাজানো হইয়াছে। থানার জমাদারবাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকিল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটিগ্রামের মুচীদের ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে না হইতেই করতালি-ধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা-চাপকান-পাগড়ি-আংটি-চেনঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয়জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই, চোখে চশমা কর্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল, সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের একজন উকিল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালি-ধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তারপর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজ সাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন, কেউ যদি কিছু বলতে চান।

কেহ সাড়া দিল না। আবার সভাপতি বলিলেন, বলুন, বলুন, যদি কেউ কিছু বলতে চান।

রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু এবার নুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, নুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন।

নুটুবাবু—নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর মহকুমার মোক্তার। সমবয়সী না হইলেও নুটুবাবুর সহিত মুন্সেফবাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। নুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন আমাকে।

সভাপতি মাফ করিলেন না, আবার অনুরোধ করিলেন।

নুটুবাবু এবার মোটা তুসুতি চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, সভাপতি মহাশয় এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধহয় জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা নাকি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেইজন্যেই আমি কোন কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে, ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছেরও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হ'লে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেইজন্য বসন্তে নিমভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্কণা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'ল আমাদের ধনী মুখুজ্জে-বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা, আনন্দের কথা অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, এ হ'ল গরু মেরে জুতো দান, আর জুতো-জোড়াটা ওই মরা গরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা, ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্বল, রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সুদ তস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে তাদের পথে বসিয়ে—

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখুজ্জেবাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণ-মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

নুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয়, তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ

বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতই হাস্যকর। আমার মনে হয়, এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুর-গাছের সঙ্গে—মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় ব'সে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের স্নদের হার চক্রবৃদ্ধিহারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা। আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি ক'রে স্নদ মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে, কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে আমাদের হেঁসো—খেজুরগাছের গলা কাটবার জন্যে খাঁটি ইস্পাতে তৈরী অস্ত্র—এই এঁরা। নুটুবাবু এবার সরকারী কর্মচারিবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হ'লে হেঁসো না হ'লে হয় না। হেঁসো চালালে গলগল ক'রে মিষ্টরসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ ক'রে দেয়। আজ তেমনি এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোক পেয়েছে, তাতে তাদের বুক-ফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এজন্যে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দু তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

নুটুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বার-কয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তারপর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন

মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে-বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মত ফুলিতেছিলেন।

কোন মতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তারপর মুখুজ্জেরা মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতই, ন্নটু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সংবাদটা কিন্তু ন্নটুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কাথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া ন্নটুবাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন নাকি?

না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

তা হ'লে বলুন, নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে তো আপনাকেই বলে—কলিযুগের দুর্বাসা।

ন্নটুবাবু বলিলেন, না, তা হ'লে কোন্ দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে সাগরতলে তাঁকে আবার একবার নির্বাসনে পাঠাতাম।

ন্নটু মোক্তার ওই এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়াছিলেন, সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ওই তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি. এ. পাস করিয়া ন্নটুবাবু স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল, শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওই স্বভাবের জন্যই তাঁহার

সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ।—সেবার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।

হুটুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনিও মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন?

এ 'কেন'র উত্তর তাঁহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া হুটুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যেভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইভাবেই সে দাসীর মত ব্যবহারই পাইয়াছে।

হুটুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর আপন মনেই বলিলেন, দুর্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি! সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হুটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

হুটুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।

তাহার পরই তিনি মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই তিনি মোক্তারি পাস করিয়া রামপুর মহকুমায়

প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক নুটুবাবুর স্ত্রীর পাতের নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও, একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।

পরিবেশকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তারপর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে নুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুটির ঝাড়, গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরানো ওদের স্বভাব।

নুটুবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রিজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্যভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশি। সে আমলের কোন এক রাজবাড়িতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, মশায়, স্বয়ং ভগবান ব'লে গেছেন, যদা যদাহি ধর্মস্য—

নুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা দূর হয়নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, জদা জদা নয়, য়দা য়দা।

নুটুবাবুর পিতার নাম ছিল—কুনো কালীপ্রসাদ। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোন দিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোন দিন করেন

নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত, কি অহংকার লোকটার! যাক, ওসব পুরাতন কথা।

নুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ-গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল, নুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন, কোথায় কাহার কাছে নুটু মোক্তারের হ্যাণ্ডনোট বা তমসুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ নুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জে-বড়কর্তা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?

কমলপুরেই নুটুবাবুর বাড়ি, তাঁহার জমিজমা পুকুর বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে।

সরকার উত্তর দিল, অবস্থা অবশ্য তেমন ভালো নয়, তবে ওই চলে যায় কোন রকমে সব। দু-এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়।

কর্তা বলিলেন, তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল শরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।

মাস চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় নুটুবাবু সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী বলিল, ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।

নুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, তাকে নাকি কঙ্কণার বাবুরা মারধোর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

ন্টুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়মমত সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করিয়া ন্টুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কই, দুধ গরম হয়েছে?

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, ন্টুবাবু বলিলেন, দেখ, ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে, তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।

স্ত্রী বলিল, বেচারার যে হাপুস-নয়নে কান্না, আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।

মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া ন্টুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। ন্টুবাবু তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ। কি হয়েছে আগে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

ন্টুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, বলি উঠবে, না কি?

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসংকোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

ন্টুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে বল।

আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি পোনা তিন ছটাক, এক পো করে—

তিন ছটাক, এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল।

আজ্ঞে, জোর করে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

তারপর ?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, আর কি করেছেন ?

আজ্ঞে, আমার গরু-বাছুর জোর করে ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

আর ?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, চাপরাসী দিয়ে ধ'রে বেঁধে আমাকে—

আর সে বলিতে পারিল না।

নুটুবাবু বলিলেন, হুঁ। কিন্তু কারণ কি ? কিসের জন্যে তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন ?

কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, আজ্ঞে, আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, নুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। নুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।

নুটুবাবু বলিলেন, হুঁ, তারপর ?

আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত করে বললাম—হুজুর, তা আমি পারব না। তিনি বেরাম্ভন—ভালো লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিব। তাতেই আজ্ঞে—

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক্ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ, তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর। দেখ, ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিও। আর সে যদি না পার, তুমি

আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা আমি তোমার পূরণ ক'রে দেব।

তারপর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খান-কয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন।

গভীর মনোযোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া ন্টুবাবু যখন উঠিলেন তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী জংশন স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক্ হইয়া ন্টুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ন্টুবাবু বলিলেন, তুমি তখন থেকে ব'সে আছ মহাভারত ? জল তো খেয়েছ, কই তামাক-টামাক তো খাওনি ?

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, আজ্ঞে, এই যাই।

ন্টুবাবু বলিলেন, তোমার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি পূরণ ক'রে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতিপূরণ তো করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ন্টুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্নেহ-স্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, আজ্ঞে বাবু, ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা, এক পো, তিন ছটাকের বেশি নয়।

ন্টুবাবু বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন, যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া ন্টু স্ত্রীকে বলিলেন, আজ থেকে আর আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো হবে না।

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল, সে কি ! ও কি সব্বনেশে কথা !

নুটুবাবু বলিলেন, না, হবে না।

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

নুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনার উপরের সাজানো আবরণ খানখান হইয়া খসিয়া গিয়া সত্যের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু আসিয়া বলিলেন, নুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া নুটুবাবু বলিলেন, বলছেন কি আপনি?

ভালই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্টে যাবেন। তারপর ধরুন, নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে, কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

নুটুবাবু বলিলেন, বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধূলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি ছি, কি যে বলেন আপনি, নুটুবাবু!

নুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভালো লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে ; পায়ের পথ তো সংকীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত।

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভালো। তারপর কিন্তু আর ও-প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিস্‌মিস হইয়া গেল। নুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ ও লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খান-দশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মত আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে! ধেই-ধেই করে নাচছে গো সব! নুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়া ছিলেন, তেমন ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই, কিন্তু নুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের

মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর—আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য, গোঁয়ার মহাভারত কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। নুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে, বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়্। জলে বাস ক'রে কি কুমীরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমীরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ ক'রে মরাই ভালো।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, অলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, অলক্ষ্মীই আমার ভালো দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কি বল্? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গী করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই, চণ্ডাল কসাই।।

দুইদিন পরেই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মমভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহু কষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, জল !

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা।

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, মহাভারত !

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি ?

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, আরে শোন্, শোন্ !

কোন কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, খট খট লবডঙ্কা, খট খট লবডঙ্কা, আর আমার করবি কি ?

গোমস্তা মুখ লাল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, জানিস বেটা চাষা, পৃথিবীটা কার বশ ?

দিন-দুয়েক পরেই রামপুর হইতে নুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া নুটুবাবু উকিলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ

করিলেন। তিনি উকিল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

এবার কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হুটুবাবুর তদ্বিরে তদারকে স্বয়ং এস. ডি. ও. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব-গোমস্তাকে পর্যন্ত আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। হুটুবাবু নিজেও সদরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন না, সরকারী উকিলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকার লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া হুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, মিটিয়ে ফেলুন, তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।

হুটুবাবু বলিলেন, বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোসে মেটে? কোন কালে মেটেনি, মিটবেও না।

শেষ পর্যন্ত বলিলেন, বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে ক'রে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না হয় দেখি!

প্রস্তাবকারীরা মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল। বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকিলের সম্মতিক্রমে হুটুবাবু প্রথমে সওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, আজ

ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে ধনীর অপরাধে ধনীর অনুগ্রহ দুর্বলের ওপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া আজ ধর্মাধিকরণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে বিচার একজন করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র-বিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন; তিনি বলেছেন: 'It is easier for a camel to go through the eye for a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God.' (ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটের প্রবেশও সহজ।)

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকিল আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বিচারে অপরাধীদের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে নুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল ব'সে আছে।

নুটুবাবুর মাথায় তখনও ওই মকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, একটা দায়রা, আর দুটো এস. ডি. ও-র কোর্টের।

পিছন হইতে একজন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, চমৎকার আর্গুমেন্ট হয়েছে! এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো-জামা পাল্‌টাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে, তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব।

নুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, পাঠিয়ে দিও। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না।

বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহিত নুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনরো বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া নুটুবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ির ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজো তরফের কর্তা। নুটুবাবুর দরোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া আসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কর্তা ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, তাই তো হে, নুটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে, অ্যাঁ! বাঃ বাঃ বাঃ, বলিহারি, বলিহারি!

কর্তার পুত্র একজন খানসামাকে বলিলেন, একবার উকিলবাবুকে খবর দাও দেখি, বল, কঙ্কণার বড়কর্তা সেজোকর্তা এসেছেন।

নুটুবাবু বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ!

বড়কর্তা বলিলেন, সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না, তাড়িয়ে দেবে?

নুটুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোন মানুষে পারে?

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে বড় উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়। দেখি, কে হারে!

নুটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বেশ, এখন বসুন।

বড়কর্তা বলিলেন, ধর, তোমার বাড়ি ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে বলে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!

নুটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষা চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু। আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি, নইলে যাই।

নুটুবাবু বলিলেন, বেশ, বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয়, দেব।

বড়কর্তা বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

তাঁহার পুত্র আসিয়া নুটুবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল। নুটুবাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজোকর্তা বলিলেন, তোমার ছেলে খুব ভালো, বি. এ-তে এম. এ-তে ফার্স্ট হয়েছে; তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে, সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।

নুটুবাবু বড়কর্তার এবং সেজোকর্তার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, আপনাদের নাতনী আমার ঘরে আসবে, সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।

সমারোহের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল, সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয়স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় লয় নাই। কয়েকটি হাভাতে

অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলির জ্বালায় ছবি-ফুলদানিগুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

হুটুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ঈজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ওই কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ, বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার ফাউণ্টেনপেনটা পাওয়া যাইতেছে না। হুটুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের শ্যামাঠাকরুণকে আজই বাড়ি যেতে ব'লে দাও।

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, তাই কি হয়? নিজে থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়? আপনার লোক।

হুটুবাবু বলিলেন, আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার চাই বাপু, দোহাই তোমার, বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়েথুয়ে দাও, চ'লে যাক ওরা, নইলে ঘরদোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে।

গৃহিণী একটু বিব্রতভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। হুটুবাবু ক্লান্তভাবে চেয়ারে শুইয়া, বোধ করি, পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া রায়ের নথি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল।

হুটুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মকদ্দমার রায়ের নকল। মকদ্দমাটায় হুটুবাবুর অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি

চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে নুটুবাবুর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচারপদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম হুটপাট শব্দে এই আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান, রক্ষে কর।

চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলি দেখিতে দেখিতে একখানা অতি পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হ্যাঁ, পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুরই চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন: যাবার বাতিক অসম্ভবরূপে প্রবল হ'লেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হ'ল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বউমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে লিখিয়াছেন:

আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন, মা-লক্ষ্মীর অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ করে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি 'পথের ধূলোয় নামাব' বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধ'রে পারা যায় না! মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি—টাক পড়েছে, টাক?

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মত তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মুহূর্ত

আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মত তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হি-হি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফবাবুর ব্যঙ্গহাস্য বক্র-মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। রতনপুরের কালীর মা, পারুলের শ্যামাঠাকরুণ উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কি তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। মহাভারত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, পারুলের শ্যামাঠাকরুণ বাড়ি যাচ্ছেন, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

হুটুবাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু কই, দরজা কই?

সুক্কু ও ভুক্কু

ভিখারী ওরফে ভুকু—ওরফে ভাকি, আর সুকুমার ওরফে সুকু। ভুকু একটি কুকুর, সুকু একটা এগার বারো বছরের ছেলে।

ভুকুর আসল নাম ভিখারী নয় ভিখিরী লাল। নামেই ওর পরিচয় আছে। বছর দুয়েক আগে সুকুর বয়স তখন নয়, কোথা থেকে বাড়ির পাশে শীতের রাত্রে একটা মায়ে-খেদানো বা মা-মরা হাড় জিরজিরে কুকুরের বাচ্চা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সারারাত্রি শীতের তাড়নায় কেঁউকেঁউ করে কেঁদে এবং দরজায় নখ দিয়ে আঁচড়ে কাউকে ঘুমুতে দেয়নি।

প্রথম ঘুম ভেঙেছিল ষষ্ঠী চাকরের। দরজায় আঁচড়ের শব্দ শুনে সে ডেকেছিল ঝি বিলাসিনীকে। কালো দশাসই চেহারা। বিলাসিনী সেই ধরনের লোক—যারা বিছানায় পিঠের দিকে আগুন লাগলে এক পাক ফিরে একটু সরে শোয়, কিন্তু উঠে আগুন নিভিয়ে শোওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। যদি আগুনটা এগিয়ে আসে আর এক পাক ফিরে শুলেই হবে। বয়স অনেকটা। তা প্রায় পঞ্চান্ন ষাট হবে ; তাই যদি কেউ বলে—দেওয়াল পর্যন্ত পাক ফিরে জায়গা ফুরুলে কি করবে বিলাসিনী। বিলাসিনীর কথাগুলি ভারী মিষ্টি—সে সেই মিষ্টি ভাষায় বলে—ত্যাখন না হয় উঠে এসে ই-পাশে শোব, যি-পাশটা পুড়ে শেষ হয়েছে।

—তার আগে যদি ঘরটাই জ্বলে ওঠে ? তখন ?

—ত্যাখন নাহয় সবাইকে ডাকব। পারি তো দুয়োর খুলে বেরিয়ে এসে অন্য ঘরে শোব ! এই বিলাসিনীকে ডেকেছিল ষষ্ঠী।

—শুনছ ? মাসী ! শুনছ !

—হুঁ। বল, ক্যানে।

—চোর। দরজা কাটছে।

—মুখে ঢাকা দিয়ে শোও।

—শোব ?

—হ্যাঁ। কাটতে কাটতে রাত শেষ হয়ে যাবে। না হয় কেলান্ত হয়ে ফিরে যাবে।

—যদি না যায় ?

—তবে সি যা হয় হবে। নিয়ে যাবে বাসনপত্তর। কি করবে ? শোরগোল করলে রেগে হয়তো মারধোর করবে। শোও।

ষষ্ঠী কি করবে ভেবে না পেয়ে ফিরে এসে দরজার গায়ে কান পেতেছিল। এবার আঁচড়ানো শব্দের সঙ্গে কুঁইকুঁই কেঁউকেঁউ শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝেছিল—চোর নয়, কুকুর। এবার সে লাঠি নিয়ে, দরজা খুলে, লাঠি তুলেও—মারতে পারেনি। মরে যাবে এইটুকু বাচ্চাটা এ লাঠি খেলে। পায়ে লাথি মেরে খানিকটা দূরে ফেলে দিয়েছিল, তারপর হেট হেট হেট শব্দ করে তাকে তাড়াতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাড় জিরজিরে কুকুরছানাটা সেই যে চিত হয়ে পড়ে লেজ নাড়তে শুরু করেছিল—তা আর থামায়নি। যেন সে কত অনুগত, কত আপনার। বিরক্ত হয়ে ষষ্ঠী ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। মরুকগে বেটা। কিন্তু বেটা মরেনি, বেটা ফের এসে দ্বিগুণ উৎসাহে দরজা আঁচড়ে কেঁউকেঁউ শব্দ শুরু করেছিল।

ষষ্ঠী বিরক্ত হয়ে উঠে ছানাটার লেজ ধরে তুলে টেনে দূরে ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারেনি ; জীবহত্যার ভয় হয়েছিল। শেষে ভেবে-চিন্তে সেই শীতের রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে—বেশ খানিকটা গিয়ে আর এক গৃহস্থের দাওয়ায় রেখে দিয়ে এসেছিল। ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজাটি দিচ্ছে এমন সময় শুনেছিল—কেঁউ।—

সর্বনাশ, বেটা সেখানে থাকেনি ; ষষ্ঠীর পিছু পিছু চলে এসেছে।

ষষ্ঠীর বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগেরও আর সীমা থাকেনি।—কি, কি করবে এৰার ? আর তার দোষ নেই ! বলে দরজা খুলে মারতে গিয়েও একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ—ভগবানকে সাক্ষী মেনে, বলে কয়ে মারা দরকার ! হিন্দুর ছেলে—বৈষ্ণবমন্ত্র—, নইলে পাপ হবে যে। সেটার দরকার। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেছিল—তুমি সাক্ষী থাক, আমার আর কিন্তু দোষ নাই বাবা ! বার বার এই তিনবার।

বলে তুলেছিল লাঠি। কিন্তু মারা হয়নি ! যাচ্চলে ! কই বেটাচ্ছেলে ? যাক বেঁচে গেছে। ভয়ে পালিয়েছে। ষষ্ঠীও বেঁচেছে পাপ থেকে। হরি বোল ! জয় ভগবান !

ষষ্ঠী এবার নিশ্চিন্তে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। একটা বিড়ি খেয়ে শুয়েছে—ঘুমটি আসছে আসছে হয়েছে—এমন সময়। লে বাবাঃ !

এবার কিন্তু কুকুর নয়। এবার বিলাসী মাসী। মাসী যেন চমকে উঠেছে—ওই ! অই ! ও-মাগো ! অই ! ই কি গো ! ও ষষ্ঠী !

বিরক্ত হয়ে ষষ্ঠী বলে—কি, ছোটদের মত দেয়ালা করছ ক্যানে ?

—পিঠে যে কি সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ও ষষ্ঠী ?

—সুড়সুড়ি দিচ্ছে ? পিঠে ?

—হ্যাঁ। অ বাবাঃ। অই—অই। ই মাগো ! ই বাবা—গায়ে যি নিশ্বেস ফেলায় গো ! ও মারে ! ই যি সাপের মত সরু মতন—ও গো বাবা গো !—এরপরই—ই—ই—ই শব্দ করে—যে বিলাসী মাসী বিছানায় আগুন লাগলেও ওঠে না, পাশ ফিরে শোয়—সেই মাসী ধড়মড় করে উঠে গায়ের কাঁথাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।—সাপ !

—কুঁই—কুঁই। উত্তর দিয়েছিল কুকুরের বাচ্চাটাই। অর্থাৎ—না—সাপ নই। মুই-মুই।

শুনে বিলাসী মাসী বলেছিল—ও মা টে! সাপ ক্যানে হবে। ই সেই কুকুরছানাটা! দেখ দেখিনি করণ! হা ষষ্ঠী, তুমি বুঝি ঘরে ঢুকিয়ে আমার কাছে দিয়েছ ছেড়ে!

ষষ্ঠীর রাগ হয়নি—তার ভারী কৌতুক হয়েছিল। কুকুরছানাটা ঘরে ঢুকে গেছে সেই অবসরে, যে সময়টায় সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে সাক্ষী মানছিল। চোখ ছিল আকাশে—বেটা মাটির উপর গুড়গুড় করে খোলা দরজায় ঢুকে পড়ে বিলাসী মাসীর গরম বিছানার ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়েছে।

বেশ করেছে। খুব করেছে। বলিহারী বেটা!

বিলাসী মাসী বলেছিল—ষষ্ঠী! বলি কথা কও না যি!

ষষ্ঠী হা হা শব্দে হেসে যেন ফেটে পড়েছিল।

বিলাসী মাসী বলেছিল—আ মরণ, এত তা বলে হাসছ ক্যানে হা-হা-হা-হা-হা-হা। হাসির কি হল? ওই ওই—ও বাবা, ই কুকুর যি কোলে চড়ে বসছে গো! দেখ দিকি—ই কি করি এখন? ও ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী বহু কষ্টে হাসি চেপে চুপ করে পড়েছিল।

—ও ষষ্ঠী! অই—অ—ষষ্ঠী! শুনছ? ষষ্ঠী!

—হুঁ, শুনছি!

—কি করি আমি এখন?

—যা মন হয় কর।

—মনে যি কিছু আসছে না!

—তবে শুয়ে পড়, ওটাকেও পায়ের কাছে চাপা দিয়ে রাখ।

—পায়ের কাছে? তা পায়ে যদি চেটে দেয় কি আঁচড়ে দেয়!

—তবে কোলের কাছে লাও। উঁহু—তা লিয়ো না। গায়ের ঘাম নোন্তা, বেটা চাটবে!

—ওমা! তবে আমি কি করি?

—তুমি জানলা খুলে বাইরে ফেলে দাও বেটাকে।

—ফেলে দোব। বাইরে—এই শীতে? এই টুকুন ছানা—

—তবে জানি না। আমাকে আর জ্বালিও না। ঘুমুতে দাও।

বিলাসী মাসী আর ডাকেনি যষ্ঠীকে। সে খানিকটা ভেবে-চিন্তে নিয়ে কুকুরটাকে একটা বস্তাকাটা চট চাপা দিয়ে পাশে রেখে শুয়ে পড়েছিল।

সকালবেলা সুকুর সঙ্গে ভুকুর মিলন। সকালবেলা উঠে সুকু নীচে নেমে আসতেই ভুকু তার সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলে। সুকু অবাক্ হয়ে গেল—বললে—তুই কোত্থেকে এলি?

ভুকুদের এক ধরনের ডাক আছে—গ-গ-গৌ!—

সুকু হেঁট হয়ে বসল ওকে পরীক্ষা করতে। ভুকু চিত হয়ে শুয়ে পা চারটে তুলে দিয়ে মাটির উপর লেজ পিটাতে লাগল পটপট শব্দে।

সুকু আশ্চর্য হয়ে গেল ওর আনুগত্য দেখে এবং চমৎকার লেজ পিটানো দেখে।—বাঃ রে! বলে সে তার বুকে একবার আঙুল ঠেকিয়ে দিলে। ভুকু আদরে টেরে-বেঁকে গেল, মুখটা এদিকে একবার ওদিকে একবার ঘুরিয়ে দাঁতের দু পাটি বের করে ঠিক যেন হাসতে লাগল।

—বারে। বারে। বারে! হাসছে আবার।

—ওটা কোত্থেকে এল? কে আনলে?—সুকুর মায়ের গলা।

—সুকু, তুমি?

—না তো। সকালে উঠে দেখছি সিঁড়ির মুখে বসে আছে।

—বিলাসিনী! কে আনলে এটাকে?

বিলাসী উত্তর দিল—উ আমাদের ভিখিরীচরণ মা। ওকে কি আনতে হয়? উ আপুনি আসে। কাল রাতে ফুক্ করে ঢুকে গিয়েছে।

—বের কর, বের কর ওটাকে। বের কর! বেরো—বেরো!—মা হাত ওঠালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভুকু আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ে চার পা তুলে দিলে ; এবং লেজটি মাটিতে পিটাতে লাগল। পটপট পটপট। শুধু তাই নয়—দাঁত মেলে ঠিক যেন হাসতে লাগল।

সুকুর মা বললেন—আরে আরে! রকম দেখ হতচ্ছাড়ার। আমি যেন ওকে আদর করছি। বিলাসিনী তুমি দূর কর ওকে। যাও, ফেলে দিয়ে এস। যাও।

বিলাসিনী বললে—আমি লারব মা। উ আমার গা চেটে দেয়। ল্যাজ দিয়ে পটাং-পটাং করে বাড়ি মারে। ষষ্ঠীকে বলেন।

মা ডাকলেন—ষষ্ঠী! বের কর ওটাকে। এক্ষুনি বের কর।

ষষ্ঠী এসে ঘাড়ের চামড়া ধরে ওটাকে বাইরে দিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজার বাইরে কুকুরটাএকপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল।

কতক্ষণ পর—বাইরের দরজায় ভিক্ষুক এসে দাঁড়াল—হ-রি-বোল! ভিক্ষ পাই মা!

সঙ্গে সঙ্গে ভুকু তাকে শাসন শুরু করে দিল—ভেক্‌ভেক্—ভেউ-ভেউ—ভেক্! —আঁ—ভেক্। আঁ—ভেক্—ভেক্ ভেক—ভেউভেউ ভেউ!

বিলাসিনীই ভিক্ষে দিতে বেরিয়েছিল। সে হেসে বললে—অ! তু ধরে নিয়েছিস—এ বাড়ির সব ভিক্ষে তোর। বা রে ভিখারীচরণ, বা।

ষষ্ঠী ঘর মুছতে মুছতে বললে—হ্যাঁ, বেটার তেজ আছে!

ওর ডাক শুনে সুকুও বেরিয়ে এসেছিল—বাঃ, কুকুরটা তো খুব তেজী!—সুকুর হাতে একটা রবারের বল। বলটা এক সময় হাত থেকে খসে পড়ে লাফিয়ে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা লাফিয়ে উঠে ধরে ফেললে সেটাকে।

—বাঃ রে! বাঃ।—এই—দে—দে! দেখ পালায় দেখ! এই—এই! ’ই ধার আও। নিয়ে আয়। এখানে, এখানে! বাঃ। ঠিক এনেছে। কিন্তু—কিন্তু—।

সুকু তার কান ধরে মুচড়ে দেয়—কুকুরটা আর্তনাদ করে ওঠে। —সুকু ছেড়ে দিয়ে বলে—কী, আর ফাজলামি করবি?

কুকুর দাঁত বের করে হাসে আর সুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ছুটে যায়—ভেক্ ভেক্ শব্দ করে; একটা কাক এসে সুকুর ওপাশে বসেছিল। কুকুরটা তাকে তাড়া করেছে। বোধহয় বলছে—খবরদার! আমার ভালবাসায় ভাগ বসাতে এস না।

বিলাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওরও খুব ভালো লেগেছে বাচ্চাটাকে। ভিতর থেকে সুকুর মা হেঁকে ডাকলেন—কি হচ্ছে বিলাসিনী? ভিক্ষে দিতে গিয়ে করছ কি?

বিলাসিনী বললে—ভিখিরীচরণের কি তেজ মা!

—কার?

—ওই ভিখিরীচরণ—কুকুরটার। গজরাচ্ছে। ভেকভেক করছে। জাতটা ভালো।

সুকু ভিখিরীচরণকে বগলে পুরে বাড়ি ঢুকল; উঠানে ছেড়ে দিয়ে উঠানের এঁটোকাঁটা ভক্ষণরত কাকগুলোকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—উস্—উস্—।

ভিখিরীচরণ লাফ দিয়ে ছুটল—ভেউ ভেউ ভেউ—ভেক্ ভেক্—ভেক্—। ভেউ। ভেউ—ভেক্ ভেক্—ভেক্। এবং লাফাতে লাগল।

মাও দেখছিলেন এবার। তিনিও স্বীকার করলেন এবার—তাই তো, কুকুরটার তো তেজ আছে বেশ! খুব ভুকায় তো!

সুকু বললে—ওর নাম হবে মা ভুকু! সুকুর কুকুর—ভুকু।

সেদিন বিকেলবেলা থেকে সুকুর সঙ্গে কুকুরটা ঘুরতে লাগল।

সুকুর জাঠতুত বোন মিনি সুকুকে দেখতে পারে না,—সে দেওয়ালের গায়ে ছড়া লিখলে খড়ি দিয়ে—

সুকুর এবং ভুকুর—
মিলন দেখিয়া ঠাকুর—
হাসিছে খুকুর খুকুর।

ঠাকুর মানে ঈশ্বর। কিন্তু তিনি যে কেন হাসবেন সে কথা কেউ জানে না, হয় তো মিনিও না ; তবুও মিনি ওই ভাবেই লিখলে কারণ ও ছাড়া মিল করে কিছু বানাতে পারলে না। সুকু অবশ্য এতেই চটে গেল। উত্তরে ওর তলায় কি লিখবে ভেবে পেলে না। শেষ পর্যন্ত ছড়াটা ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে এল। কিন্তু রাগে খুকু মনে মনে গর্জাতে লাগল। তার পরদিন সুকু দেখলে সেই মুছে দেওয়া ছড়াটার পাশে মিনি আবার লিখেছে—নতুন ছড়া—

ভিখিরী হলেন ভুকু— বল দিকিনি কোথা ?
চুকু—চুকু—চুকু— বাড়ির পিছে ময়লা গাদা যেথা।
ওরে নেড়ী কুত্তার হারাধন— ভুকু যাবে খেতে—
রইল রে তোর নিমন্ত্রণ— সুকু যাবে সাথে।

জবাবটা হঠাৎ এসে গেল সুকুর মাথায়। সে লিখল তার পাশেই—

পুলিশ কুকুর 'লাকি' ভাকি গিয়ে ধরবে—
সুকুর কুকুর 'ভাকি'— কাঁদলে না—ছাড়বে।
সাবধান মাছ-চোখী— সাবধান—সাবধান—
(মিনির নাম মীনাক্ষী) যাবে প্রাণ যাবে মান।
চুরি করে খাচ্ছো কি—

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি এসে সুকু বিলাসিনী, যষ্ঠী এবং বাসন মাজা, নর্দমা সাফ করার ঝি রানীকে বলে দিল—ভুকু নয়, ভাকি। কুকুরটাকে 'ভাকি' বলে ডাকবে। নইলে ভালো হবে না।

ভুকু হল 'ভাকি'।

বিলাস্বিনীর কিন্তু মনে ধরত না, বা মনেও থাকত না—সে যখন তখন ডেকে ফেলত—ও ভিখিরী। ভিখিরী রে!

সুকু শুনতে পেলে চিৎকার করে উঠত—বিলাসিনী!

মা সেদিন বিরক্ত হয়েছিলেন, সুকুর চিৎকারে। তিনি ধমকে বলেছিলেন—কেন—কি হল? ভাকি—! কেন, ভাকি কেন? হতচ্ছাড়া কুকুর কোথাকার—! বিলাসিনী ওটাকে দূর করে দে ঘর থেকে। ভাকি! লাকির মত ভাকি! তা হ্যাঁ, গুণের মধ্যে গন্ধে গন্ধে যেখানে খাবার রাখ চুরি করে খেতে পারে। আর গন্ধে গন্ধে ময়লা মাটি কোথায় আছে—ঠিক খুঁজে বের করতে পারে।

সুকুর মুহূর্তে রাগ হয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে একটা বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে ভাকিকে ওরফে ভুকুকে, ওরফে ভিখিরীকে পিটাতে শুরু করলে নির্মমভাবে।—নিকালো! নিকালো! নিকালো!

মা বললেন—সুকু। সুকু!

—না—।

বিলাসিনী এগিয়ে এল—হেই দাদাবাবু!

—না! না! না!

কুকুরটা নির্মম প্রহারে জর্জরিত হয়ে তারস্বরে আর্ত চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল বাড়ি থেকে। সুকু তবু ক্ষান্ত হল না। সেও পিছনে পিছনে ছুটল। ছুটল এবং পাড়া থেকে কুকুরটাকে বের করে দিয়ে এসে ক্ষান্ত হল। শুধু ক্ষান্তই হল না, ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল।

মা বললেন—ভালো হয়েছে। যা উপদ্রব শুরু করেছিল!

তা সত্যি। ময়লা শুধু খেয়ে নয়, মধ্যে মধ্যে মেখেই আসত। তার উপর রোগ ধরেছিল কাপড় ছেঁড়া। আলনায় মেলে দেওয়া

কাপড়ের আঁচল বাতাসে দুলত, আর ভাকি বা ভুকু বা ভিখিরী লাফ দিয়ে সেটাকে ধরে টান দিত। সেটা নীচে পড়লে, তাকে দাঁতে ধরে শিকারের মত নাড়া দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলত। তার উপর চুরি করে খাওয়া। যেখানে যা রাখবে তার গন্ধ ও পাবেই এবং ফাঁক পেলেই তাতে গিয়ে মুখ দিত। সুযোগ পেলে খেয়ে শেষ করে দিত। গেছে, ভালই হয়েছে।

ষষ্ঠী বললে—ভালো হয়েছে। আপনি ক্ষেপেছেন মা। এই দেখুন না ক্যানে, খানিক পরেই এসে বার দরজায় হাজির হয়ে ডাকবে—কেঁউ! কেঁউ! কেঁউ! দুয়ার খুললেই চিত হয়ে পড়ে চার পা তুলে মাটির ওপর লেজ আছড়াবে পটপট করে। দরজা না খুললে ওই মুড়ির মধ্যে দিয়ে মুখ গলাবে—আর মাসীকে ডাকবে—মাসী মাসী!

বিলাসিনী বললে—এই দেখ, আমার ওপর লাগল দেখ। ক্যানে—তোমাকে এসে ডাকবে না, দাদা—দাদা বলে!

কিন্তু আশ্চর্য! সকলের অনুমান ব্যর্থ হয়ে গেল। ভিখিরী ভুকু বা ভাকি—আর ফিরে এল না।

সেদিন রাত্রে বিলাসিনী শুয়ে ঘুমোল না ভালো করে। মধ্যে মধ্যে ষষ্ঠীকে ডেকে বললে—ষষ্ঠী!

—কি?

—দুয়ারে শব্দ উঠছে না?

—উঠছে? উঁহু—না তো!

—আমি যেন শোনলাম, খসখস শব্দ।

ষষ্ঠী বললে—দেখব খুলে?

—তোমার মন।

ষষ্ঠীর সে মন হল। সে উঠে খুলে দেখলে। কিন্তু না, বিলাসিনী মাসীরই ভ্রম। কেউ নেই, কিছু নেই বাইরে।

বিলাসিনী বললে—তা হলে শেয়ালে ধরেছে—না হলে মরে পড়ে আছে—যা মার দিয়েছে দাদাবাবু!

এরপর হয় তো ভালো হয়—ভুকু ফিরে এসে যদি এ বাড়ির কোন মহা বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে নিজে মরে।

ধরা যাক—রাত্রে বাইরে এসেছে ভুকু, এবং চিৎকার করছে গর্জন করছে—ঠিক সুকুর ঘরের পিছনে।

একটা সাপ ঢুকছিল—নর্দমা দিয়ে। ঘরে সুকু ঘুমিয়ে পড়েছে পড়তে পড়তে। বাইরে ঠিক সময়ে এসে পড়ে ভুকু তার লেজে আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে চিৎকার করছে। সাপটা ঘুরে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারপর তুমুল যুদ্ধ। সাপটাকে জখম করে—ভুকুও মরল সাপের বিষে।

ভুকুর একটা সমাধি হল।

এ হলে ভালো হতো; কিন্তু তা হয়নি। তবে ফিরেছিল ভুকু। সেই কথাটাই বলি।

বছর দুয়েক পর।

সুকু এগারো বারো বছরের হয়েছে, স্কুলে পড়ছে। বিলাসিনী আছে, ষষ্ঠীও আছে। ওদের সংসার যেমন চলছিল, চলছে। বরং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে। সুকুর বাবার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। সেদিন ঠিক তখন বেলা ন'টা।

সুকুদের বাড়ির বাইরে চার পাঁচটা কুকুরের সমবেত চিৎকার। পাড়ারই কুকুরগুলো। যেন কোন জটা দাড়িওলা কিংবা কাবুলিওলা কিংবা বিচিত্র দেখতে কোন লোককে দেখে চিৎকার করতে লেগেছে।

লোক নয়—একটা নতুন কুকুর। সুন্দর বলশালী কুকুর। এই এতখানি উঁচু, চকচকে রোঁয়া, কাটা লেজ, খুব শক্ত সবল দেহ—দেখে ভয় লাগে, এমন কুকুরকে। ভঙ্গীতে যেন বেপরোয়া ভাব। হনহন

করে ছুটে চলে আসছে। এতগুলো কুকুরকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন খুব কাছে এসে পড়ছে, তখন বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে শক্ত দাঁতের সারি বের করে—এ—এ—এউ—অ্যাও—শব্দ করে পা কতক এগিয়ে আসছে। এরা ভয়ে হটে যাচ্ছে। আবার ও ফিরে ছুটছে। এসে কুকুরটা ছুটে ঢুকে পড়ল সুকুদের বাড়িতে। ষষ্ঠী দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার ঢোকার রকমসকম দেখে ভয়ে সরে গিয়ে বললে—বাবারে! ই কামড়াবে নাকি—পাগলা নাকি?—ও বাবা!—বলে সে একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেঁচাতে লাগল। কুকুরটা গ্রাহ্যও করলে না। সে তার ঘাড়টা ঘোড়ার মত তুলে লাফ দিয়ে উঠানে পড়ে পাক দুই ঘুরে ছুটে ছুটে এঘর দেখলে ওঘরে ঢুকল—তারপর সটান ছুটে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

ষষ্ঠী চেঁচালে—কুকুর! ক্ষ্যাপা কুকুর! ক্ষ্যাপা কুকুর!

সুকুর মা পূজো করছিলেন। তিনি পূজো ছেড়ে উঠে দরজা বন্ধ করবেন কিনা ভাবছিলেন। হঠাৎ কুকুরটা এসেই দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। এবং মায়ের দিকে তাকিয়ে মোটা ভরা গলায় ডেকে উঠল—ভৌ—ঔ—ঔ। ও—ও—ঔ।

ওদিকে সুকু বেরিয়ে এল তার শোবার ঘর থেকে বারান্দায়। সে ইস্কুল যাবার জন্যে জামা-কাপড় পরছিল। এবং কুকুরটাকে দেখেই সে বলে উঠল—আরে—!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও লাফ দিয়ে গেল তার কাছে, এবং তাকে পাক দিয়ে যেন নাচতে লাগল; কাটা লেজটা নাচাবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোমর বেঁকিয়ে বার দুই ঘুরল, তারপর পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটো সুকুর ঘাড়ে তুলে দিলে; লম্বা লকলকে জিভ বের করে সুকুর মুখটা একবার চেটে, নিজের মুখটা আকাশের দিকে তুলে ডেকে উঠল—ভো—ও—ও—ঔ। ভো—ও—ও—ঔ।

মা পূজোর আসনে আর বসে থাকতে পারেননি, উঠে বেরিয়ে এসে সভয়ে দেখছিলেন আর চেঁচাচ্ছিলেন, প্রকাণ্ড কুকুরটা বোধহয় সুকুকে ফেলে এইবার টুঁটি কামড়ে ধরবে।—কি হবে মা—গো! ছেড়ে দে সুকু। ছেড়ে দে। ওরে!

সুকু কিন্তু তখন তাকে চিনেছে। সে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে—ভুকু—ভাকি—ভাকি!

বিলাসিনীও আবার বলে উঠল—তাই তো! ই যি আমাদের ভিখিরীচরণ!

ভিখিরী এবার সুকুর ঘাড় থেকে নেমে, বিলাসিনীকে এক পাক বেড় দিয়ে নেচে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—ভো—ও—ও—ঔ।

বোধ হয় বললে—হ্যাঁ—গো—!

তারপর আবার সুকুর কাছে।—ভো—ও—ও—ঔ।

হঠাৎ সুকুকে ছেড়ে তীরবেগে ছুটে উঠে গেল ছাদে। কয়েকটা হনুমান সেখানে বসে ছিল। সেগুলোকে তাড়িয়ে নেমে এল নীচে, এবং বসল গিয়ে মায়ের পূজোর ঘরের সামনে—মা দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। ভুকু ডাকলে—ভো—ও—ও—ঔ।

মা এবার বললেন—তাইতো ভুকুই তো, ভারী সুন্দর হয়েছে তো! কোথায় ছিল? কোথেকে এল? কোথায় ছিলিরে এতদিন? অ্যাঁ। ভুকু!

ভুকুর একটি উত্তর—ভো—ও—ও—ঔ।

—দাও, বিলাসী খেতে দাও কিছু ওকে। দাও দাও।

বিলাসিনী খাবার এনে নামিয়ে দিলে। ভুকু শুঁকতে লাগল। খেতে গিয়েও যেন খেতে মন চাচ্ছে না।

বিলাসিনী বললে—রাগ করেছিস, নয়? না—না। খা। তাই তো তু কেমন সুন্দর হয়েছিস, বড় হয়েছিস!

সুকু এবার নিজে এসে তার মুখে লুচি পুরে দিতে লাগল। সুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা খেলে ভুকু !—নে—খা ! খা !

ঠিক এই সময় ঘরের উঠানে এসে দাঁড়াল এক সাঁওতাল-জোয়ান। নিকষ কালো মাজা রং, বাবরি চুল, গলায় পুঁতির মালা, কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, চোখে ব্যগ্র চকিত চাহনি—এসে ডাকলে তু—তু—টুংরা। তু—তু—তু—তু ! ইদিকে—ইদিকে। টুং—রা… !

মুখের খাবার ফেলে দিয়ে সুকুর হাত ছাড়িয়ে ভুকু ছুটে গেল তার কাছে। নাচলে, আনন্দ প্রকাশ করলে—ঠিক তেমনি করেই বললে—ভো—ও—ও—ঔ !

মাঝির মুখ খুশীতে ভরে উঠল। বললে—চল, ঘর চল।

সুকু বললে—না, আমার কুকুর ভুকু। ভুকু ! ভুকু !

ভুকু ফিরে তাকালে—বললে—ভো—ও—ও—ঔ।

মাঝি বললে—তুর কুকুর লয়, আমার কুকুর। তুর ছিল আমি জানি। সি দিন তু উকে মেরে খেদায়ে দিলি—এই টুকুন বাচ্চা তখুন। আমি কুটুম বাড়ি এসেছিলম। বাড়ি যাচ্ছিলম—উকে কুড়ায়ে লিলম। কোলে করে নিয়ে গেলম তিন কোশ পথ। মেরে তুরা খোঁড়া করে দিয়েছিলি। আমি ওষুধ দিলম, ভালো করলম। কুকুরটার জাতটা ভালো দেখে চিনেছিলম কিনা ! তা পরেতে পাখি মেরে মাস খাওয়ালম—যতন করলম। শিকার শেখালম। এত বড় করলম। এখুন এমন তেজী কুকুর মাঝিদেরও নাই। দু বছর হঁয়ে গেল—ইবার ইখানে শ্বশুরবাড়ি এলম তো উকেও নিয়ে এল। ভেবেছিলম ভুলে গিয়েছে। তা বেটা ছাড়া পেয়েছে কি তীরের মতন ছুটল। তুদিকে দেখতে এল। এখন এমন ভালোটি দেখছিস, বলছিস—তুদের কুকুর। আয়, টুংরা আয়। চল—। দেলা—।

সুকুরা কেউ এর জবাব দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

মাঝি চলে গেল—ভুকু তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। চলতে চলতে কিন্তু হঠাৎ দাঁড়াল। ফিরে ওদের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল—ভো—ও—ও—ঔ!

এবার মাঝি ঘুরে এসে নিজের গামছাখানা তার গলায় জড়িয়ে টানলে, এবং মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললে—আঃ—আঃ—আঃ—।

তারপর গামছাটা খুলে দিয়ে নিজে ছুটতে লাগল এবং চিৎকার করতে লাগল—লে—লে—লে—লে!—লেলে—লেলে।

ভিখিরী—ভুকু—টুংরা—হাউহাউ শব্দ তুলে ছুটতে লাগল পিছনে পিছনে।

এখানেই শেষ নয়। পরের দিন সাঁওতাল পাড়ায় গেল সুকু। সে দশটাকা দেবে, ভুকুকে তার চাই।

কিন্তু শুনলে—মাঝিটা আগের দিন চলে গেছে কুকুর নিয়ে। পাছে তার কুকুরটা বাবুরা কেড়ে নেয়, তাই শ্বশুরবাড়ির ভোজ নেমন্তন্ন খাওয়া ছেড়েই সে চলে গেছে।

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। চাঁদ চাহিলে শিশুকে চাঁদের বদলে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মত ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা ইচ্ছে করগে যাও, দুটো হাতী কিনে আনগে।

কল্পিত হাতী দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রঙলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রঙলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকোটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে!

যশোদা অবাক, হাতী—হাতী। বলি, ওরে বেটা, কখন আমি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রঙলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতী' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতী কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁরে মুখ্যু, ভালো গরু না

হ'লে চাষ হয় ? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত ক'রে, এক হেঁটো মাটি হবে মোলাম ময়দার মত, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রঙলাল ধরিয়াছে, এবার সে গরু কিনিবে। এই গরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। রঙলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনও অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিঙ, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গরুর মত গরু যেন আর কাহারও না থাকে। গরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিঙ দুইটিতে তেল মাখায়, সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোনদিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা কেষ্টর জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রঙলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও মন্দ হয় নাই; এই জন্য এবার রঙলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গরু তাহার চাই-ই। এক জোড়া গরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রঙলালের মমতা নাই। গরু দুইটি ছোটও নয়, এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি ; আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসচে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা ?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রঙলাল জানে না, তবে গরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রঙলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি এক শত টাকার সংস্থান করিয়াছিল যশোদার মা। সে রঙলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হবে ? তুমি গরু কিনে আন না ! কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে।

রঙলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে।

যশোদার মা বলিল, এ গরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এগুলো বন্ধক দিয়ে গরু কেনো, ভালো গরু নইলে গোয়াল মানায় ?

সে আপনার গহনা কয়খানি রঙলালের হাতে তুলিয়া দিল। রঙলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রঙলাল টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গরু-মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মত দুইটি গরু সে সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মত সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ ! এ যে—! ওরে বাস্ রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা !

হাজার হাজার না হইলেও গরু মহিষ মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে

জুটিয়াছে। গরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে এক অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রঙলাল সেই ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকাররা চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মত—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

রঙলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনের মত সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রঙলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলিকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলি ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মত। কতকগুলি একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাৎ কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলির গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থক্‌থক্ করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রঙলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রঙলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রঙলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে।

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় একটু রক্ত পড়ত, আর কি হ'ত?

রঙলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হ'ত?

দাও দাও ভাই, দাও, হাত ফসকে হয়ে গেইছে। রঙলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রঙলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কি, লাঠির প্রান্তে যে স্থূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও।

রঙলাল বেশ করিয়া দেখিল, স্থূচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় স্থূচ বসাইয়া রাখে, ওই স্থূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মত ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রঙলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলিকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রঙলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারিপাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গরু এ বাগানে নাই। রঙলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না, হাতী? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রঙলাল কখনও

দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, একে লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই-ই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্থতে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রঙলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মত কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু।

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে; পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কোনও খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রঙলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। ওই টাকাতেই তাহার হইল; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক-গুলি টাকা তাহার এতদিন আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল,

সত্যই রঙলালের আর সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রঙলালকে দিয়া দিল। রঙলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রঙলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মত উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে সে জ্বলিয়া যায়। রঙলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রঙলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে —মাটির নিরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতীই একজোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু একজোড়া বলদ কিনিয়াছে। বলিল, বেশি বড় গরু ভালো নয় বাপু। বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় হয় না—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রঙলাল বলিল, গরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?

হ্যাঁ।

আর এমন ক'রে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। —যশোদার মা ঝংকার দিয়া উঠিল।

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ্ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও— চল, দুগ্‌গা ব'লে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় কগাছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট! এক-একটির কুম্ভকর্ণের মত খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে।

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটিকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটি ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে চাহিয়া সকলকে দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রঙলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস কোন ভয় নাই, চ'লে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা।

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রঙলাল বলিল, অ্যাই, খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভূষি দেবে—বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মত চেহারা!

রঙলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হ'ল কালাপাহাড়। আর এইটার কি নাম হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশী হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশী হইল না।

রঙলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোম্ড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

রঙলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তা নয়; এটা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি, যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রঙলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি ?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কি বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছিটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রঙলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—···া! অবিকল মহিষের ডাক। দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁা শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রঙলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

রঙলাল দুইটির গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চ'লে যাবি নাকি ? এই কাছে-পিটে চ'রে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে; রঙলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলা-ক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুইধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়।

প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে। রঙলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মত সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নিচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এই রঙলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রঙলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটিকে পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটিই সরিয়া দাঁড়ায়। রঙলাল সেদিন দুইটিকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে ; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবি—তবে তো !

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রঙলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মত গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাসফ্যাস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রঙলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাসফ্যাস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রঙলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ

গ্রহণ করিয়াছে। রঙলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁা—আঁা—আঁা!

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁা—আঁা—আঁা!

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনের মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রঙলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার একদিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধহয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মত বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল।

রঙলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মত চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই-একটা অতিক্ষীণ আক্ষেপ হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রঙলালের দিকে—চোখ হইতে দরদরধারে জল গড়াইতেছে।

রঙলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ-আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রঙলাল বলিল, জোড়া নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড়া একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড়া কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখন কাঁচা এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারিখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রঙলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হ'লে—হ্যাঁ।

নূতনটাকে বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব!

রঙলাল বলিল, ওঠ ওঠ, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মোড়ল মশায়, শিগগির এস গো। কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেললে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রঙলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলেছে মশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণে হয়তো মেরেই ফেললে!

রঙলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটাটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রঙলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্ত করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রঙলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ বিগড়ে গিয়েছে।

রঙলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ

হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মশায়! কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলবে আমাকে।

রঙলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রঙলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রঙলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রঙলালের কোলে তুলিয়া দিল। রঙলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রঙলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে,—আঁ—আঁ—আঁ!

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রঙলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মত সে তাহাদের পেটের তলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য তাহার সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রঙলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এই মোষ কি কেউ নেবে মশায় ?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম 'হইল ! পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রঙলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁ—আঁ—আঁ !

রঙলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ-আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড় ! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রঙলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে ! আমার জান মেরে ফেলত মশায় !

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কাহার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায় !

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি ! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রঙলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রঙলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

রঙলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়া-জানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, রঙলাল তাহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল। মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা। এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের বরাত আছে। দামও সে ভালই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রঙলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক্, আমি চ'লে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেয়ো। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রঙলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রঙলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রঙলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকে শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মত ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কি?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ? ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রঙলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে আর রঙলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায়, কতদূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেবল্‌কে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।